হাওড়া-আমতা রেলের দুর্ঘটনা !

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

প্রকাশক—শ্রীভুবনমোহন মজুমদার বি, এস-সি
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ — ১৩৪৭

প্রিণ্টার—শ্রীননীগোপাল সিংহ রা
তারা প্রেস
১৪বি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিক

হাওড়া-আমতা রেলের দুর্ঘটনা !

এক

'প্রাপ্তেষু ষোড়শে বর্ষে'—চাণক্য বলে গেছেন,—'পুত্রমিত্র-বদাচরেৎ !' কিন্তু সে পুত্র যদি বদ হয়, তাহলে কি-রকম আচরণ করবে তার সম্বন্ধে তিনি কিছু বলে যান্‌নি। সে-বিষয়েও চাণক্যের একটা-কিছু বাৎলে যাওয়া উচিত ছিল, বাবা এই কথা ভাব্‌ছিলেন। একটা ছেলেকে তো একেবারে বধ করা যায় না—বিশেষ নিজের ছেলেকে !

কিন্তু যারা তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, তারা বল্ল, "অত দুঃখ কর্‌ছেন কেন মশাই ? একেবারে না হোক্, এক কোপে না হোক্, ছেলেটাকে তো আপনি তিলে-তিলে বধ করেছেনই ! বল্‌তে কি, অত আদর দিয়ে ওর মাথাটা আপনিই তো চিবিয়ে খেয়েছেন !"

বাবা এতে ঠিক সান্ত্বনা পান্ না ! বুড়োদের যেমন কথা ! ছেলেকে আদর করবেন না, বারে ! নিজের ছেলেকে আদর না করে কি পরের বুড়োদের ধরে ধরে আদর করতে যাবেন ?

সান্ত্বনাদাতাদের এরকম ঘেরাও হয়ে আক্রমণের কারণ, আজ সকালেই তাঁর ষোড়শবর্ষীয় ছেলে তাঁর সঙ্গে ঘোরতর কলহ করে' বাড়ী থেকে উধাও হয়েছে ! কলহের হেতু এমন কিছু না ! উল্লেখের অযোগ্য একটা যা-তা ছুতো উপলক্ষ্য করে'—

একধারে বাবার গোঁ, অন্যধারে ছেলের গোঁয়ারতুমি—যা নিয়ে চরাচরে যাবতীয় বাবা আর ছেলের মধ্যে চিরকাল দ্বন্দ্ব বেধে আস্‌চে—কিন্তু সেই যৎসামান্য অজুহাত থেকেই, নিউটনের সুবিখ্যাত আপেল-পতনের মতো, অভাবিত অভানীয় এই বিপর্য্যয় ব্যাপার!

দিকে-দিকে, এদিকে-ওদিকে, দিগ্বিদিকে তিনি লোক পাঠিয়েছেন কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কেউ এসে একটা খবর দিতে পারেনি। ছেলেটা কোন্ তীর দিয়ে তিরোহিত হয়েছে, কারু মুখে টুঁ শব্দেও টের পেলে এখুনি তিনি তীরবেগে বেরিয়ে পড়তে পারেন। কখন থেকে তিনি হাঁস্‌ফাঁস্ করছেন কিন্তু এখন অবধি ঘুণাক্ষরেও একটা সংবাদ এসে পৌঁছিল না।

অবশেষে খবর এল। ভগ্নদূতের মুখে বার্ত্তা পাওয়া গেল, ছেলে কদম্‌তলা ইষ্টিশনে হাওড়া-আমতার রেলগাড়ী চেপে পিট্‌টান্ দিয়েছে। কদম্‌তলার ছেলে কদম্‌তলা ইষ্টিশনেই গাড়ী চাপবে, এতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না; কিন্তু সেই লোকটির মারফতে ছেলের যে-চিরকুট্ পেলেন, তাই পড়ে বাবা হতবাক্ হয়ে গেলেন!

তাতে লেখা ছিল: "বাবা, তুমি মিছে আমার অনুসন্ধান কোরো না। আমার খোঁজ পাবে না। এখান থেকে সোজা আমি করাচী চল্লাম। সেখানে এয়ারট্রেণিং নিয়ে, পাইলট্ হয়ে সরাসরি যুদ্ধে চলে' যাব। আমার জন্যে ভেবোনা তুমি। আমার জন্যে ভাবনার আর রইল কি? আমি—আমি তো মারা যাব

না! সহজে মর্‌বার ছেলে আমি নই, এইটুকুই মাত্র বল্‌তে পারি। ইতি—"

চিরকুট্‌ পড়ে বাবা বললেন—"য়্যাঁ? হাওড়া-আমতার রেলগাড়ী চেপে করাচী চল্ল কি রকম? ও-গাড়ী তো করাচী পর্য্যন্ত যায় না! ওতো আমতায় গিয়েই থেমে যাবে, যদ্দূর আমি জানি…"

তিনি নাম্‌তা ভুলে গেলেন। তক্ষুণি একটা ট্যাক্‌সি ডেকে যে-কাপড়ে ছিলেন, সেই কাপড়েই হাফ্‌-হাতা জামা গায়ে আর তাপ্পিমারা জুতো পায়ে, হাওড়া-আমতা কর্‌তে কর্‌তে, ভোঁ—ভোঁ—ভর্‌র্‌—ভর্‌র্‌—ভর্‌র্‌র্‌র্‌—শব্দে সবেগে তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

সান্ত্বনাদাতারাও বল্‌তে-বল্‌তে চলে' গেল—ক্ষুণ্ণ হয়ে চল্‌তে-চল্‌তে বলে' গেল—"যান্‌, ছেলে করাচী গেছে, আপনিও ওর কাছাকাছি যান। রাঁচি চলে যান্‌।"

ট্যাক্‌সি-বেগে যেতে-যেতে বাবা মনে-মনে মানসাঙ্ক কষেন—কদমতলায় গাড়ী চেপেছে আটটা-চারে; এতক্ষণে সে-গাড়ী বল্‌টিকারি, ব্যাকড়া, শালাপ্‌—এ-সমস্ত পেরিয়ে গেছে নিশ্চয়! এখন আন্দাজ নটা-পনেরো? তাহলে কুন্তলিয়া, মাকড়্‌দা, ডোমজুড়—এ-সব ষ্টেশনও পার হয়ে গেছে। আটটা-চারে কদমতলায় ছাপলে, মাকড়দায় পৌঁছুতে আটটা-চল্লিশ—ডোমজুড় আটটা-একান্ন—দক্ষিণবাড়ী নটা-দুই!—(হাওড়া-আমতা লাইনের গাড়ীরা কখন্‌-কখন্‌ ছাড়ে,—কোথায় ছাড়ে আর কোনখানে ধরে, কখন কোথায় ধরা পড়ে, এসব বার-বার রপ্ত হয়ে বাবার

নখদর্পণে!) তাহলে তাকে ধর্‌তে হলে ধর্‌তে হবে—সেই গিয়ে বার্‌গাছিয়া জংশনে! তার এধারে নয়। বার্‌গাছিয়ায় গাড়ী পৌঁছবে নটা-আঠারোয় আর ছাড়বে নটা-ছাব্বিশে। এর মধ্যেই হতভাগাকে হাতে-হাতে পাকড়ে গেরেপ্তার করতে হবে। করাচীতে পৌছুবার আগেই।

এবং তিনি নিরুদ্দিষ্ট ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ট্যাক্‌সিওলাকে বার্‌গাছিয়ার দিকে আরও তাড়া দিয়ে চালাবার বরাদ্দ ছান্। এমন কি, বার্‌গাছিয়ার গাড়ী ধরিয়ে দিতে পারলে—ইষ্টিশনে তাঁকে পৌঁছিয়ে দেবার সাথে সাথেই উপরি আরো দু চার আনার বকসিস্ দেবার ভয় দেখাতেও তাকে কসুর করেন না।

দুই

হাওড়া-আমতা রেলগাড়ীর গার্ডের কাছে এ-অঞ্চলের যাত্রীরা প্রায় মুখস্ত। কে যে কোথায় ওঠে আর কোথায় নামে, কারা কোন্ ইষ্টিশনের, কদ্দূর অবধি কার দৌড়, তা তাদের দেখলে তো কথাই নেই, না দেখেও বলে' দিতে পারেন। এবং এ-গাড়ীর যাত্রীরা যে কোন্ গোত্রের, তাও তাঁর জান্‌তে বাকী নেই।

এই কারণে হাওড়া-আমতার ফাস্‌ট্-প্যাসেঞ্জারের গার্ড যখন কদমতলা ইষ্টিশনে, বছর-ষোলোর এক ফুট্‌ফুটে ছেলের কলেবরে একেবারে সম্পূর্ণ অপরিচিত একখানি মুখ, একখানা ফাস্‌ট্‌ক্লাস্ কামরা একলাই দখল করল দেখলেন, তখন তাঁর বেশ-একটু বিস্ময়বোধ হোলো! ছেলেটি তাঁর অচেনা তাই তাঁর বিস্ময়ের

কারণ নয়, সে যে প্রথম শ্রেণীর মধ্যে প্রবেশলাভ করেছে তাও হয়ত না, যদিচ, হাওড়া-আমতার রেলগাড়ীতে প্রথমশ্রেণীর কামরা ঐ একটি আর একমাত্রই, এবং তার আরোহীও অতি কদাচিৎ; কিম্বা যেহেতু ছেলেটিকে দেখে, তার সোনার হাত-ঘড়ি বুক-পকেটের দামী ফাউণ্টেন্ পেন্, পায়ের পাম্প্-শু, টুইডের হাফ্-প্যান্ট্ আর স্মার্ট্ হাফশার্ট—তার চক্‌চকে চেহারার সঙ্গে ঝক্‌ঝকে পোষাক মিলিয়ে দেখলে, অত্যন্ত বড় লোকের ছেলে বলেই সন্দেহ হয়—হাওড়া-আমতা-রেলগাড়ীর যে-কোনো কাম্‌রাতেই যে-দৃশ্য অতি দৈবাৎ এবং অতীব বিরল—কেবল তাই যে তাঁর অতিরিক্ত বিস্ময়ের কারণ, তা বল্লেও হয়ত অত্যুক্তি হবে। অথচ এই সমস্ত জড়িয়েই তিনি নিজেকে বিস্ময়-জর্জ্জর বোধ কর্‌ছিলেন।

কে এই ছেলেটি? কোথ্‌থেকে এল? কাদের ছেলে? আর যাবেই বা কোথায়? গাড়ীর আন্দোলনের সঙ্গে মিশ্ খেয়ে এই সব প্রশ্ন তাঁর মনে রীতিমত আলোড়ন তুলেছিল। ষ্টেশনের পর ষ্টেশন, যতই তিনি এসবের কোনো কিনারা করতে পারছিলেন না, তাঁর মানসিক আলোড়ন শনৈঃ শনৈঃ ততই বেড়ে উঠছিল।

এবং এই আলোড়ন একেবারে উত্তুঙ্গ হয়ে ঠেলে উঠল, যখন তিনি দেখতে পেলেন—বার্‌গাছিয়া ইষ্টিশনের প্ল্যাটফর্ম্মে, তাঁর গার্ড-ভ্যানের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে যখন তিনি দেখলেন—পতাকা উড়িয়ে ট্রেণ্-ছাড়ানো হুইস্‌ল্ দেবার অন্তিম ক্ষণের একটু আগে হাফ্-হাতা জামা গায়ে, আধময়লা খাটো কাপড়ে,

উস্‌কো-খুস্‌কো একজন মুশ্‌কো লোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল এবং ঐটুকু সময়ের মধ্যেই গাড়ীর ও-মুড়ো থেকে এ-মুড়ো পর্য্যন্ত প্রত্যেক কামরার মধ্যে কুটিল কটাক্ষ হেনে এক দৌড়ে তিন চক্কর ঘুরে এল—যেন সমস্ত গাড়ীখানাই তার হাঁ করে গেল্‌বার মৎলব! অবশেষে প্রথম শ্রেণীর কামরার কাছে এসে—কাছাকাছি এসে—চক্ষের পলকে সে যেন স্থগিত হয়ে পড়ল! এক পলকের জন্যই! কামরার মধ্যে সে হঠাৎ গোলকুণ্ডার খনি আবিষ্কার করেছে, তার গোল-গোল দুটো চোখ এমনি করে' জ্বলে' উঠল যেন! তার সেই হীরকোজ্জ্বল দৃষ্টি—হীরার মত ধারালো চাহনি—হাওড়া-আমতা ফাস্‌ট্‌-প্যাসেঞ্জারের গার্ডবাবু স্পষ্টই যেন প্রত্যক্ষ করলেন।

এবং প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি পতাকা উড়িয়ে বাঁশী বাজিয়ে দিলেন, গাড়ীও ছেড়ে দিলে; আর সেই মুশ্‌কো লোকটাও প্রথম শ্রেণীর আর গার্ডের কামরার মাঝামাঝি একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরার হাতল ধরে', চট্‌ করে' উঠে, ঝট্‌ করে' তার অন্তর্গত হয়ে গেল!

তিন

গাড়ী বার্‌গাছিয়া ছাড়ল, আর গার্ডের উত্তেজনাও সীমা ছাড়াল!

প্রথম-দর্শনেই তিনি পরিষ্কার বুঝে ফেললেন,—এই মুশ্‌কো লোকটি আস্ত একটা বদ্‌মাস্‌, এক-নম্বরের পাকা ডাকাত। কোন্‌ এক বড়লোকের ছেলে হাতঘড়ি-কাউন্টেন্‌ পেন লাগিয়ে এই

গাড়ীতে চলেছে, কোথ্‌থেকে এই খবর পেয়ে রাহাজানির মৎলবে পিছু-পিছু ধাওয়া করে' এসেছে। বার্‌গাছিয়াতেই ছেলেটার নাগাল পাওয়া যাবে,—এমনও হতে পারে,—হয়তো আগে থেকেই তার জানা ছিল।

বাংলাদেশ থেকে যতগুলি রহস্য-রোমাঞ্চ-সিরিজের সস্তা গোয়েন্দা-কাহিনী বার হয়, আমাদের গার্ডবাবুটি তাদের একজন একনিষ্ঠ পাঠক। এবং তাঁর পড়া-শোনা যে ব্যর্থ হয়নি, বিফল হয়নি, কেবলমাত্র আকার প্রকার দেখেই এই মুশ্‌কো লোকটিকে পরিপাটিরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারাটাই তার চূড়ান্ত প্রমাণ!

অত্যন্ত সম্প্রতিই, 'রেলগাড়ীতে রাহাজানি' বলে' রোমহর্ষক একখানি বই তিনি পড়েছিলেন—

এবং তার পরেই, তাঁর গাড়ীতেই আজ এমন কাণ্ড! ভাবতে-ভাবতে তাঁর উত্তেজনা চরম সীমায় উঠল। তিনি চাঞ্চল্য দমন করতে পারলেন না, তাঁর ছোট্ট কামরাটির ভেতরেই ছট্‌ফট্‌ করে' পায়চারি করতে লাগলেন।

কিন্তু তিনি আর কী করতে পারেন? এখন পর্য্যন্ত লোকটি তাঁর পাশের কামরায়, একশো এগারো নম্বরেই বসে রয়েছে, এখনো প্রথম শ্রেণীতে পদার্পণ করেনি। কিন্তু পরের ইষ্টিশনেই সে যে কামরা বদ্‌লে ফেলবে এ তিনি দিব্য নেত্রে দেখতে পাচ্ছিলেন। কিন্তু দেখলেই বা কী? রাহাজানি থামাতে তিনি কতদূর আর কী করতে পারেন? তিনি তো পুলিশের কর্ম্মচারী নন্‌! আইনতঃ কতটুকু তাঁর ক্ষমতা?

ভাবতে ভাবতে তাঁর মাথা গরম হয়ে ওঠে। বাস্তবিক, ভেবে দেখলে, তাঁর দৌড় বেশী দূর নয়। এমন কি এক নম্বরের কামরাতেই, ছেলেটির সীমান্ত ঘেঁষে যদি ওই এক নম্বরের বদ্‌মাইসটিকে দেখা যায় তাহলেই বা তিনি কী করতে পারেন? বড় জোর গিয়ে তার টিকিট্ চাইতে পারেন! যদি সে প্রথম শ্রেণীর টিকিট্ দেখিয়ে ছায়, তাহলেই তো চক্ষুস্থির! বিনা টিকিটে উঠে থাকলে বাড়তি গাড়ীভাড়া, জরিমানাসমেত ধরে' দিলেই ব্যস্, চুকে গেল সব! তাহলেই তাঁর হাম্বিতুম্বি ফুরিয়ে গেল! গাড়ী থেকে ঘাড় ধরে' সমারোহ করে' নামাবার সব ক্ষমতা খতম্!

দেখতে দেখতে আর ভাবতে-ভাবতে পাতিহাল্ এসে পড়ল। পাতিহালে থামতেই চারধারের হাল্‌চাল্ দেখবার জন্যে গার্ডবাবু নেমে গেলেন। পাশের কামরার ধার ঘেঁষে যাবার সময়ে তাঁর চোখ পড়ল সেই মুশ্‌কো লোকটির পানে। কনুইয়ের ওপর মাথা রেখে সে যেন কি ভাবছে! কি করে' তার কাজ হাঁসিল করবে, তারই মতলব ভাঁজছে নিশ্চয়!

লোকটার পাশ দিয়ে যাবার কালে, যাতে ওর কর্ণগোচর হয় এম্‌নিতর উঁচু গলায় তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—"ছি—ছিই—ছিঃ!" এই সব অপকর্ম্মাদের সম্বন্ধে সমস্ত সভ্যসমাজের ধিক্কার ধ্বনি, এক বাক্যে, ঐ একমাত্র অব্যয় শব্দে উচ্চারণ করে' ওর প্রতি সবেগে নিক্ষেপ করলেন। লোকটার কানে গিয়ে সেঁধুল কিনা কে জানে!

তারপর প্রথম শ্রেণীর সামনে এসে দেখলেন, সেই ছেলেটি

বিস্মিত দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে। কী ভয়াবহ ভবিষ্যৎ যে তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বার জন্য ওৎ পেতে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে—একেবারে একান্ত আসন্ন হয়ে এসেছে—এসে পড়ল বলে'—যার ধাক্কায়, এমন কি, আশু তার গতাসু হবার পর্য্যন্ত আশঙ্কা—তার বিন্দুমাত্র ছায়া তার চোখে নেই! পৃথিবীতে আবার দুষ্কর্মা লোক আছে নাকি! তার অনিষ্ট করতে পারে এমন কেউ আছে নাকি কোথাও! এই ছোট্ট ছেলেটি তা যেন ভাবতেই পারে না। মুশ্‌কো লোকটি তার মুখোমুখি এসে পড়লেও, ভাবতে পারবে কিনা সন্দেহ। বিশ্বের বিষয়ে বিস্ময়কর বিশ্বাস—তার বিস্মিত চক্‌চকে চোখের চাউনির ভেতর দিয়ে যেন সহস্র ধারায় উছলে পড়ছে।

হাওড়া-আমতার ফাস্‌ট্‌ প্যাসেঞ্জারের গার্ড কোনো কথা না বলে' ছোট্ট একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ফিরে এলেন।

আসবার মুখে, সেই মুশ্‌কো লোকটির সঙ্গে চোখাচোখি হতে তিনি চোখ পাকিয়ে কট্‌মট্‌ করে' তাকালেন। আইনের রক্তচক্ষু যে এখানেও জাগ্রত রয়েছে, এই সংবাদটাই এবার বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করে' কেবল চোখালো ভাষায় জানাতে চাইলেন ওকে! জান্‌ল কিনা, বুঝল কিনা, এমন কি' চেয়েই দেখল কিনা, জানা গেল না।

পাতিহাল থেকে গাড়ী ছাড়ল, কোনো অঘটন ঘটল না। মুশ্‌কো লোকটাও কামরা বদ্‌লালো না, গার্ডবাবু তাকিয়ে দেখলেন। দেখে একটু অবাকই হলেন!...তাহলে কি তাঁর রক্তচক্ষুতে কাজ হয়েছে? তিনি যে সবই টের পেয়েছেন

লোকটা কি তা বুঝতে পেরেছে তাহলে ? ছেলেটা কি এযাত্রা তাঁর পুণ্যবলে তবে বেঁচেই গেল ?

পাতিহালের পরের ইষ্টিশন—মুন্সীর হাট। সেখানে ট্রেণ পৌঁছুতেই মুশ্‌কো লোকটা গাড়ী থেকে নেমে পড়ল। গার্ডবাবু তাঁর কামরার নীচে নেমে খাড়া হলেন। মুশ্‌কো লোকটা এখানে নামল যে ? তাহলে কি তার কুমৎলব পরিত্যাগ করে' এখান থেকেই সরে পড়বে নাকি ? আঃ, তাহলে বাঁচা যায় ! ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ে ! গার্ডবাবু লোকটার গতিবিধির দিকে লক্ষ্য রাখলেন।

কিন্তু না, লোকটা গেট্ দিয়ে বেরিয়ে গেল না। বরং ওই গাড়ী ধরা-ছাড়ার মাঝখানের মিনেটখানেক সময়, প্ল্যাটফর্ম্মের এক ধারে দাঁড়িয়ে কিসের যেন অপেক্ষা করতে লাগল। ওর কি আরো সঙ্গী-সাথী সব এখানে এসে জুটবে না কি ? গার্ডবাবু অস্থির হয়ে উঠলেন। আধ-মিনিটের মধ্যেই অর্দ্ধেক লোক না উঠতে নামতেই হুইস্‌ল্ ফুঁকে তিনি গাড়ি ছাড়বার হুকুম্ বাজিয়ে দিলেন।

কিন্তু দিলে কি হবে ! গাড়ী ছাড়তে না ছাড়তেই, গার্ডবাবু নিজের কামরার পা-দানিতে পা দিতে না-দিতেই সেই দুষ্‌মন্ লোকটা তড়োক্ করে' লাফিয়ে উঠে পড়েছে—একটু আগেই যেমনটি তিনি এঁচেছিলেন—সেই প্রথম শ্রেণীর কামরার মধ্যে। আর গাড়ীও তখন জোর্‌সে ছেড়ে দিয়েছে।

গার্ডবাবুর মাথা যেন ঘুরতে লাগলো ! এখন তার কর্ত্তব্য কী ? অ্যালার্ম দিয়ে, এই দণ্ডেই গাড়ী থামিয়ে, লোকটাকে

হাতে-নাতে পাকড়ানো ? কিম্বা বিপদ বুঝলে ছেলেটা নিজেই চেন টেনে গাড়ী থামাবে তার হাপিত্যেশে বসে' থাকা ? দুর্ঘটনার আশঙ্কায় তাঁর বুক দুর দুর করে।

হাওড়া-আমতা ফাস্‌ট্‌ প্যাসেঞ্জারের গার্ডবাবু গোলক ধাঁধার মধ্যে পড়ে রইলেন—আর গাড়ী এদিকে হুস্‌-হুস্‌ করে' ধুঁকতে ধুঁকতে আর ক্ষণে ক্ষণে বাঁশী ফুঁকতে ফুঁকতে—ছুটে চল্ল।

মুন্সীর হাট থেকে মাজু—পরের ইষ্টিশনে পৌঁছুতে পনের মিনিটের ওপর। এ-লাইনের এধারে এই দুটো ষ্টেশনের মাঝেই সময়ের ব্যবধান সর্বচেয়ে বেশি। আর আর সব ইষ্টিশন্‌ পাঁচ-মিনিট সাত-মিনিট বাদ্‌-বাদ্‌।

মুন্সীরহাট থেকে মাজু—ঢালাও লম্বা পনের মিনিট। খতিয়ে দেখলে এতটা সময় একটা নাবালকের ক্ষতিবৃদ্ধি করার পক্ষে নিতান্ত কম নয়। হাওড়া-আমতা লাইনের গাড়ীর গতিবিধি —হাড়হদ্দ—লোকটার ভালো রকম জানা আছে দেখা যাচ্ছে। যথা সময়ে যথাস্থানে কামরা বদ্‌লে যথেষ্ট মুন্সীয়ানা দেখিয়েছে সন্দেহ নেই !

এখন মুন্সীর হাট থেকে মাজু—এর মাঝামাঝি কী ঘটে, কে জানে ! দীর্ঘ পনের মিনিট বাদে পরের ষ্টেশনে পৌঁছে, ছেলেটাকে বিভিন্ন ভগ্নাংশে বিভক্ত হয়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যাবে কিনা তাই বা কে বল্‌বে !

হাওড়া-আমতা ফাস্‌ট্‌ প্যাসেঞ্জারের গার্ড অসহায় উত্তেজনায় রুদ্ধ নিশ্বাসে, আশা-আশঙ্কার দোলায় দোদুল্যমান হয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন।

চার

প্রথম শ্রেণীর কামরায় ছেলে মুক্তচক্ষে বাইরের দিকে তাকিয়ে—তার কোনো হুঁস্ নেই। বাবা আস্তে আস্তে তার পাশে গিয়ে বসলেন। নরম গলায় ডাক্‌লেন—"খোকা!"

ছেলে চম্‌কে উঠে ফিরে বস্‌ল: "এ কি! বাবা! তুমি? তুমি এখানে? তুমি এখানে এলে কি করে'?"

"রাগ করিসনে বাবা! বাড়ী ফিরে চল্।" বাবার গদ্‌গদ কণ্ঠ।

"না না—কিছুতেই না। প্রাণ থাক্‌তে আমি বাড়ী যাব না।" ছেলেটির সশস্ত্র স্বর: "আমি যুদ্ধে যাবো।"

"উঁহু।" বাবার মৃদু প্রতিবাদ। "উঁহুহু।"

"যাবই আমি।" ছেলের তরফ থেকে আবার অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা!

বাবার মাথা ঘুরে যায়।

"না, যুদ্ধে যায় না। যুদ্ধে যেতে নেই। যুদ্ধ ভালো নয়।" বাবা তাকে বোঝাতে চান্: "তাছাড়া এরোপ্লেন্ থেকে অত উঁচু থেকে তুই পড়ে' যেতে পারিস্!"

"পড়ে" যাই যাবো, আমি যাবো। পড়ে' মরে' যাই, সেও ভালো।" ছেলের গলায় বীরত্ব আর বৈরাগ্যের ব্যঞ্জনা: "আমার কে আছে?"

আমার কে আছে—তার মানে? এবার বাবার রাগ হয়। এমন জলজ্যান্ত একমাত্র বাবা বেঁচে থাক্‌তে, ছেলে বলে কি না —আমার কে আছে!—এমন ছেলের—কি বলে গিয়ে···

নাঃ, আজ সকালের সান্ত্বনাদাতাদের একজন ঠিকই বলেছিল —ছেলেদের আদর দেয়া কিছু নয়! তাদের মারধোর করে'

সায়েস্তা রাখাই ঠিক। ভূভারতে আদরণীয় যতরকমের পদার্থ আর অপদার্থ আছে—ছেলেরা, অন্ততঃ আত্মনেপদী ছেলেরা তার মধ্যে নয় ;—ওর অন্যথাচরণ করে' আদর দিয়ে যথার্থই তিনি ওর মাথাটা আস্তই চিবিয়েছেন। বেশ, তাহলে সেই পরামর্শদাতাদের নির্দ্দেশমতো ছেলের দুরন্তপনা দূর করতে এখন থেকে তিনি রুদ্রমূর্ত্তি ধরবেন। পুনরায় আদর দিয়ে আর চর্ব্বিত চর্ব্বণ নয়—এখন থেকে তাঁর অন্যরূপ। আর বাবার রূপ নয়—এবার মার মূর্ত্তি !

দেখতে দেখতে তিনি রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করেন, তাঁর চেহারা থেকে সংহার-রূপ ফেটে পড়তে থাকে : "বটে ! তোর কে আছে ? কে আছে দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ নে ? তোর বাবা আছে ! তোর বাবা এই—এইখানেই রয়েছে ! য়্যাক্ চাপড়ে দেখিয়ে দেব নাকি ? বাড়ী যাবিনে, বটে ? ঘাড় ধরে' নিয়ে যাব। দেখি, কে আট্‌কায়—কোন্ ব্যাটা বাধা দ্যায় !"

বাবার এই অপূর্ব্বতা—এই অপরূপ রূপ ছেলে আগে আর কখনো দ্যাখেনি ! সে হক্‌চকিয়ে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে' চেয়ে থাকে বাবার পানে।

ছেলেকে ঘাব্‌ড়ে যেতে দেখে বাবার সাহস বাড়ে। টোট্‌কার ফল দেখে মুষ্টিযোগের উৎসাহ হয়। টোট্‌কা এবং মুষ্টিযোগের মাঝামাঝি, পাচনের মত একটা কিছু দিয়ে, ফলেন পরিচীয়তেটা তিনি পরীক্ষা করে দেখতে চান্…

হাত বাড়িয়ে ছেলের কাণ ধরে' দ্যান এক টান।

এক টান দিতেই ধোঁয়া বেরয় ! ছেলে চমকে ওঠে—একি ! এ আবার কি রকম ?…

বাবার হাতে এমন অপমান! এ অসহ্য! ছেলে চারিধারে তাকায়—গাড়ীর কাঁধে লাগানো একটা নোটিশের ওপর তার নজর পড়ে যায় হঠাৎ! হাওড়া-আমতা-রেলোয়ে, খুব সম্ভব পরোপকারের জন্য, তার মত অপরদের উপকারের নিমিত্তই নোটিশখানা যেন ওখানে লট্‌কে রেখেছে। উক্ত রেলের কর্ত্তৃবাচ্য বা কর্ম্মবাচ্যের ভেতরে কেউ হয়ত ভাববাচ্যের বশে কবিত্বপরবশ হয়ে এই কাব্য-পরিবেশন-কাণ্ড করে' থাকবেন। ছন্দোবদ্ধ ভাষায় উক্ত নোটিশে লেখা:

থামাতে হলে এ ট্রেণ্ (হাওড়া-আমতা বল্‌ছেন)
টানো ধ'রে এই চেন্!

এবং সেই সঙ্গে সরল গদ্যে (গদ্য-কবিতাই খুব সম্ভব!) সতর্ক করে' দেয়া যে—অকারণে বা অপ্রচুর কারণে উক্ত চেন্ টান্‌লে তার শাস্তি—পঞ্চাশ টাকা জরিমানা!

গদ্য-রচনার দিকে মনোযোগ দেবার মতো মনের অবস্থা তখন ছেলের নয়।...তাছাড়া, তার কানের ওপর অত্যাচার হচ্ছে এইটাই কি চেন টানার যথেষ্ট কারণ নয়?

অতএব 'থামাতে হলে এ ট্রেণ্, টানো ধরে' এই চেন্।'—আর এক-মুহূর্ত বিলম্ব না করে' হাওড়া-আম্‌তার এই উপদেশ ছেলেটি অক্ষরে-অক্ষরে পালন করে' বস্‌ল!

পাঁচ

চেনে হস্তক্ষেপের সঙ্গে-সঙ্গেই বাবার চেহারা বদ্‌লে' গেছল। উছ্‌লে-ওঠা বীররস মুহূর্ত্তমধ্যে করুণ রসে ঘনীভূত হয়ে এল। কাঁদো-কাঁদো সুরে তিনি বল্লেন—"য়্যাঁ, এ-কী কর্‌লি! কী

সর্ব্বনাশ করলি! আমি যে টিকিট্ কেটে আসিনি রে! বিনা-টিকিটে গাড়ীতে উঠে পড়েছি! সময় কি পেলাম টিকিট কাটার? এখন গার্ডের হাতে ধরা পড়ে' যাব যে!"

"তার আমি কী জানি!" ছেলে বল্ল। "আমি—আমি কী জানি তার!" বল্‌তে-বল্‌তে, ভয় খেয়ে ছেলেও থেমে গেল।

ভয় পাবার কারণ সেই চেন্‌টাই।

চেন্ ছেড়ে দিলেও সে-চেন্ তখনো ঝুল্‌ছিল। তার হাত ছাড়া হয়ে তখনো আড়াই হাত ঝুল্‌তে থাক্‌ল। ওকে টেনে ছেড়ে দিলেই আবার তা রবারের মত স্বস্থানে ফিরে গিয়ে আগের রূপ নেবে—ফের নিজমূর্ত্তি ধারণ করবে—এই তার ধারণা ছিল, কিন্তু তার বদলে তার এই ঝোঝুল্যমান দুরবস্থা দেখে, তার হঠকারিতার দ্বারা হাওড়া-আমতা-রেলোয়ের নাজানি সে কী সর্ব্বনাশ সাধন করেছে যার জন্য গার্ড হয়ত তাকেও কসুর করবে না—সেই আশঙ্কায় ছেলেও কাহিল হয়ে পড়ল।

এদিকে গাড়ীও আস্তে আস্তে থেমে আস্‌ছে।

"কী হবে বাবা?" ছেলে দিশেহারা হয়ে কোথায় যাবে ঠিক না পেয়ে বাপের বুকে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েঃ "গাড়ী যে থেমে যাবে এক্ষুণি? আর এক মিনিটের মধ্যেই যে!"

বাবাও ঠিক সেই কথা ভাবছিলেন।

"চেন খারাপ করা দেখলে তারা আমাকে ধরে নিয়ে যাবে না তো?" ছেলের আতঙ্কিত কণ্ঠ।

বাবাও প্রায় সেই রকমের কথাই ভাবছিলেন—তবে ছেলের ধৃত হওয়া নয়, নিজের উদ্ধৃত হবার সম্ভাবনাই তাঁর বেশী ভাবনার কারণ হয়েছিল ! চেনের দশার চেয়ে নিজের উপস্থিত দুর্দশাই তাঁকে বেশী পীড়িত করছিল।

"বাবা ! বাবা !"···ছেলের অসহায় আর্ত্ততা।

তাঁর মাথায় চট্ করে' একটা বুদ্ধি খেলে যায়। তিনি ঝট্ করে' গাড়ীর মেঝেয় দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সুবিস্তৃত হয়ে শুয়ে পড়েন—একদম টান হয়ে !

"আমি ফিট্ হয়ে গেছি। যাই ঘটুক্, এই কথা বলবি, আমার মূর্চ্ছা দেখে তুই ভয় খেয়ে গাড়ীর শেকল টেনেছিস্। বুঝ্লি ?"

"তুমি ফিট হয়েছ আর আমি শেকল টেনেছি ! এই তো ? বুঝেছি।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওই কথাটা আঁক্ড়ে থাক্বি, তাহলেই দুদিক রক্ষা। আমার বিনা-টিকিটে গড়ী-চড়া—আর তোর চেন-টানা।"

"কিন্তু এই ময়লা মেজেয় এমন করে, লম্বা হলে তোমার কাপড় জামা যে নোংরা হয়ে যাবে বাবা !"

"সে কথা চেন্ টানার আগে—এই নোংরা কাজ করার আগে ভাবা উচিত ছিল। এখন ভেবে লাভ ?"

বল্তে বল্তে তিনি দুই চোখ মুদ্রিত করেন, আর ট্রেণও প্রবল একটা ঝাঁকুনি খেয়ে থেমে যায়।

ছয়

চেন টানা পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আমাদের গার্ডবাবুর হয়ে এসেছিল! তার হ্যাঁচ্‌কা টান কেবল গাড়ীতে নয়, তাঁর নাড়ীতে পর্য্যন্ত গিয়ে লেগেছিল। এতক্ষণ যা আশঙ্কা কর্‌ছিলেন, তাই হোলো তাহলে এতক্ষণে!

এখন বাকী যেটুকু আছে, তাঁর কর্ত্তব্যের অবশিষ্টাংশ, বদ্‌মাস্‌টাকে ধরে-পাকড়ে বেঁধে-ছেঁদে পুলিশের হাতে সমর্পণ করা—কিন্তু সে-কাজ যে কত দুঃসাধ্য, লোকটার হোঁৎকা চেহারা স্মরণে আসতেই তাঁর হৃদয়ঙ্গম হচ্ছিল। দুরু-দুরু বুকে কাঁপতে-কাঁপতে নিজের কামরা থেকে তিনি নাম্‌লেন।

নিজের কামরার ধার থেকে পা বাড়াতেই তাঁর মনে হোলো, অমন একটা দুর্দ্দান্ত গুণ্ডাকে একলা কি তিনি কাবু করতে পারবেন? যতই তিনি প্রথম শ্রেণীর কামরার দিকে এগুতে থাকলেন, জিজ্ঞাসার চিহ্নটা ততই বৃহত্তর হয়ে তাঁর চোখের সামনে ভাসতে লাগল। ওরকম দুর্দ্ধর্ষ ক্রিয়ার কর্ত্তারূপে কোনোদিন দুঃস্বপ্নেওতো নিজেকে তিনি কল্পনা করেন নি।

তাঁর একটা ভরসা ছিল, গাড়ীর ড্রাইভারও ওদিক থেকে এগিয়ে এসে তাঁর সহযোগিতা করবে, এবং সে লোকটা একটু ষণ্ডাগোছের,—গুণ্ডাপ্রকৃতির লোককে জব্দ করার পক্ষে একটু অদ্বিতীয়ই বইকি! কিন্তু না, বৃথাই দুরাশা! ড্রাইভার গাড়ীর এঞ্জিনের গহ্বর থেকে তার চমৎকৃত মুখখানা বার করে' তাকাচ্ছিল বটে, কিন্তু নামবার কোনো দুর্ল্লক্ষণ তার দেখা গেল না।

আর হাওড়া-আমতার যাত্রীদের কথা য[illegible] তারা মুখ বাড়ানোর কষ্টটুকু পর্য্যন্ত করেনি। চেন টানা পড়ার জন্যই যে গাড়ী আট্‌কা পড়েছে, এহেন কল্পনা, সন্দেহসূত্রেও তাদের মনে স্থান পায়নি—তারা ভেবেছে, এটা এ-লাইনের যেমন রেওয়াজ—নিত্যকার টানাপোড়েন! হাওড়া-আমতার গাড়ী চলতে-চলতে থেমে যায়, থামতে-থামতে চলে, যখন যেমন খেয়াল—এই তার চিরদিনের দস্তুর; এ-নিয়ে কে মাথা ঘামাতে গেছে?

অগত্যা ফাস্‌ট্‌-প্যাসেঞ্জারের গার্ডবাবুকে নিঃসঙ্গই এগুতে হোলো। কর্ত্তব্যের আহ্বান,—কি করবেন? নিজের বাহু-বল সম্বল করে' স্খলিত পায়ে একাই তিনি এগুতে লাগলেন।

হাতল ধরে' উঠে কামরাটার ভেতরে উঁকি মারতেই তাঁর চক্ষু চড়কগাছ! পা ফস্‌কে পা-দানি থেকে পড়ে' যান আর কি!—

সেই ছেলেটি গাড়ীর দরজার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে; খাড়া দাঁড়ানো; আর সেই হোঁৎকা লোকটা তার পায়ের কাছে একেবারে চোদ্দ পোয়া! এক ঘুষিতে অমন জোয়ানকে লম্বা শুইয়ে দিয়েছে! য়্যাঁ? কী ছেলে সব আজকালকার? অদ্ভুত!

এহেন দৃশ্যের পর কামরার অভ্যন্তরে বীর পদক্ষেপে প্রবেশ করতে আর বাধা কি? অতঃপর তাঁর আর কোনো দ্বিধা রইল না—তাঁর সাহসও যথেষ্ট বেড়ে গেল। তিনি সবল হস্তে সশব্দে খট্‌ করে' দরজা খুলে ঘটা করে' ভেতরে পদার্পণ করলেন।

ছেলেটি পেছন ফির্‌ল।

"এই যে গার্ডবাবু!" বল্ল ছেলেটি: "এই লোকটি, এই ভদ্রলোকটি হঠাৎ ফিট্ হয়ে গেছেন—আমি কি করব ভেবে না পেয়ে, ঠিক করতে না পেরে, আপনার চেন টেনে ফেলেছি!"

গার্ডবাবু ঝুঁকে পড়ে' চিৎপটাং-লোকটার বুকের ওপর কান পাত্‌লেন। নাঃ, হৃদয়যন্ত্রের ক্রিয়া স্থগিত হয়নি, বেশ দুম্‌দাম আওয়াজ হচ্ছে। নাড়ী টিপে দেখলেন, দুপ্‌দাপ্‌ করে' চলছে।

"ঠিক আছে। কোনো ভয় নেই। তেমন কিছু জখম হয়নি। মারা যাবার কোনো লক্ষণ নেই।" ছেলেটিকে তিনি আশ্বাস দিতে চাইলেন: "বেঁচেই আছে।"

"বেঁচে আছেন? আঃ, তবু ভালো!" ছেলেটির যেন স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল।

"কিন্তু বাহাদুর ছেলে বটে তুমি! কি দিয়ে বসালে লোকটাকে? বলো তো?"

"আমি! আমি তো বসাইনি। আমি কি দিয়ে বসাবো?' ছেলেটি ভয়ানক বিস্মিত: "আমি ওঁকে মারি-টারিনি। মারবো কেন? এম্‌নিতেই উনি ফেন্‌ট্ হয়ে গেছেন। আমি সত্যি বল্‌ছি আপনাকে।"

"বল্‌তে হবে না, বল্‌তে হবে না।" গার্ডবাবু বাধা দিয়ে বল্লেন: "তুমি মিথ্যে ভয় খাচ্ছ খোকা—ভয়ের কিছু নেই! আত্মরক্ষার জন্যে আততায়ীকে আঘাত কর্‌বার ন্যায্য অধিকার তোমার রয়েছে। আইনতঃ অধিকার। মেরেছ, বেশ করেছ। তাতে কি?"

"কিন্তু—কিন্তু—আমি মারিনি তো! এই লোকটি—এই ভদ্রলোকটি—আমার একজন বন্ধু ইনি।"

'বন্ধু! হ্যাঁ, বন্ধুই বটে!' মনে-মনে আওড়ালেন গার্ডবাবু 'বন্ধু আর বলে কাকে!' থানা-পুলিশের ভয়ে ছেলেটী চেপে যাচ্ছে, বুঝতে তাঁর বাকী ছিল না।

"কেয়া গার্ডসাহেব,—কেয়া হুয়া?" এতক্ষণ পরে হাওড়া-আমতা ফাস্ট-প্যাসেঞ্জারের ড্রাইবারও গার্ডের পশ্চাতে এসে দাঁড়িয়েছেন।

"এই লোকটা, এই গুণ্ডালোকটা এই ছেলেটিকে আক্রমণ করেছিল। ছেলেটি ওকে,—এক ঘুষিতে—ঘুষি কি যুযুৎসুর প্যাঁচ, কিসে বলা যায় না,—একদম্ অজ্ঞান করে' দিয়েছে। আর এখন ও বল্‌ছে, এই বদ্‌মাস্ লোকটা নাকি ওর বন্ধু।"

"সত্যি বল্‌ছি, আমার বন্ধু!" ছেলেটি জোর গলায় প্রতিবাদ জানায়ঃ "হাওড়া থেকে এক সঙ্গে আস্‌ছি আমরা।"

"এইখানেই গোলমাল হে ড্রাইবার, এইখানেই গোলমাল! ও বল্‌ছে ওরা একসঙ্গে আস্‌ছে; অথচ আমি নিজে দেখেছি, এই ছেলেটি উঠেছে কদমতলায়, আর এই লোকটা উঠল বার্‌গাছিয়ায়। তাও এ-কাম্‌রায় নয়—অন্য কাম্‌রায়। লোকটা কামরা বদ্‌লেছে, আমার নিজের চোখে দেখা—এই কেবল আগের ষ্টেশনে। এখন এথেকে কী বুঝবে, বোঝো!"

"হামি বুঝতে পারছে।" ড্রাইভার আস্তে-আস্তে ঘাড় নাড়েঃ "হুম্, আদ্‌মিটাকে দেখলেই বুঝা যায়।"

"কী বুঝা যায় শুনি?" ছেলেটির এবার রাগ হয়ে গেছে।

"সেই ধারণের আদ্‌মিই বটে।" ড্রাইভারের গুরু-গম্ভীর মুখ: "হুম, মালুম হয় বেশ।"

"মোটেই সেই ধারণের না! আমি স্পষ্ট বলছি আপনাদের।' ছেলেটি গর্জ্জন করে' ওঠে: "ইনি আমার বাবা!"

"ছিঃ! অজানা-অচেনা লোককে বাবা বলে না। পরের বাবাকে বাবা বল্‌তে নেই খোকা!"

"বাঃ, আমার নিজের বাবাকে বাবা বল্‌ব না? বা রে!"

"এইমাত্র তুমি বল্লে, তোমার বন্ধু—আর এখন বল্‌ছ কিনা—তোমার বাবা! এটা কি ভালো করছ খোকা?

"কেন, বাবা হলে কি বন্ধু হয়না?" ছেলেটিও পেছোবার নয়। "বাবার মতো বন্ধু আবার কে আছে?"

"অমৃতং বালভাষিতং!" এই বলে' গার্ডবাবু হতাশ ভাবে ঘাড় নাড়তে থাকেন।

"ওসব্‌ বাৎ ছোড় দেও। আভি কেয়া কর্‌না হ্যায় উত্তো বাৎলাও।" ড্রাইভারের সোজাসুজি জিজ্ঞাস্য।

"লোকটাকে গাড়ী থেকে নামিয়ে, পুলিশের হাতে গছিয়ে দেয়া। তাছাড়া আর কি?" গার্ডবাবুর সাফ জবাব।

তারপর গার্ড আর ড্রাইভার দুজনে মিলে ধরাধরি করে', ধরাশায়ীকে পাঁজা-কোলা করে' তুলে ধরে', লাইনের ধারে ঘাসের ওপরে নিয়ে এসে ভূমিসাৎ করল।

"এখন আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে—" ড্রাইভারের দোআঁসলা বাংলার মর্ম্মানুবাদ থেকে জানা গেল: "আগে লোকটার চৈতন্য-সম্পাদন করা। তারপর ওকে জিগ্যেস্‌ করা

—এর মানে কি? তুমি দাঁড়াও, আমি আভি আস্‌ছি। এর মধ্যে যদি ও উঠে পড়ে, কি ভাগবার মৎলব করে, কি আউর কিছু করতে যায়, অমনি তুমি ভালো রকম এক ঘা বসিয়ে ফের অজ্ঞান করিয়ে দেবে, সম্‌ঝেছ?"

এই বলে' রহস্যময় একটা ইঙ্গিত হেনে ড্রাইভার ইঞ্জিনের দিকে রপ্তানি হয়ে গেলেন।

সাত

ইতিমধ্যে হাওড়া-আমতার টনক্ নড়েছে, অঘটন কিছু একটা ঘটে' গেছে, তারা ধারণা করতে আরম্ভ করেছে। যাত্রীরা একে-একে গাড়ী থেকে নাম্‌তে সুরু করেছিল। তারা সবাই এসে 'ওয়েল-গার্ডেড্' অচৈতন্য লোকটিকে ঘিরে দাঁড়াল। এবং গার্ডবাবুও ছেলেটির সঙ্গে লোকটার ভীষণ সংঘর্ষের রোমাঞ্চকর কাহিনীকে যতদূর সাধ্য আরো ভয়াবহভাবে অতিরঞ্জিত করে' তাদের প্রাণে বিভীষিকা-সঞ্চারের চেষ্টায় লাগলেন।

ছোট্ট ছেলের ওপর রাহাজানি! হাওড়া-আমতার মেজাজ গরম হয়ে উঠল। তাদের ফিস্‌ফাস্ ক্রমে জোরালো এবং আরো ঘোরালো হতে লাগ্‌ল—বিরক্তিও কূল ছাপিয়ে গেল। প্রত্যেক মুখ-পত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রায় এক রকমের দেখা গেল—লোকটাকে উচিত-মত শিক্ষা দেয়া দরকার—উত্তম-মধ্যম এক-খানা শিক্ষা!

কিন্তু, এখনই, ওর এই বেহুঁস অবস্থাতেই—ওর এই দুরবস্থার সুযোগে উক্ত শিক্ষা দিতে সুরু করলে কেমন হয়? উচিত এবং ঠিক বীরোচিত হয় কিনা এই নিয়েই যা বাদানুবাদ

চল্‌ছিল ওদের মধ্যে। শিক্ষার্থী এই দণ্ডে শিক্ষা নেবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত কি না এই বিতর্কে একমত হতেই যা ওদের বিলম্ব হচ্ছিল।

ছেলে দেখল, সর্ব্বনাশ! কাণ্ডজ্ঞানহীন জনসাধারণ ক্ষেপে গেলে কী না করতে পারে। খবরের কাগজে তেমন কাণ্ড কখনো পড়েনি যে তা নয়। আর দেরি করলে, বাবাকে আস্তানায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া দূরের কথা, আস্ত রাখাই কঠিন হবে।

"শুনুন্ মশাই! শুনুন্ আপনারা—" ছেলে বল্‌তে সুরু করল: "আসল কথা শুনুন আমার কাছে! আপনারা ভুল কর্‌ছেন ভয়ানক! এই ভদ্রলোক আমার বাবা—আমার নিজের বাবা। এবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আজ সকালে আমাদের খুব ঝগড়া হয়েছিল। আমি বাড়ী থেকে পালাচ্ছিলাম—এই হাওড়া-আমতার গাড়ী চেপে সট্‌কান দিচ্ছিলাম। বাবা সেই খবর টের পেয়ে আমার পেছনে-পেছনে ধাওয়া করে' এসেছেন। আর আমার কাম্‌রাতে ঢুকেই আমাকে দেখে উনি ফিট্ হয়ে গেছেন। যাকে বলে পতন এবং মূর্চ্ছা,—কিম্বা মূর্চ্ছা এবং পতনও বলতে পারেন। এই হোলো আসল ঘটনা! যা সত্যি কথা, তাই বল্‌ছি আপনাদের। এর একটিবর্ণ মিথ্যে না। এক বিন্দু বানানো নয়।"

এতদূর বলে' ছেলেটি থাম্‌ল।

ছেলেটির স্বীকারোক্তির সরলতা, সবলতা আর সাবলীলতা, আস্তে-আস্তে হাওড়া-আমতার মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করবার

পথ পায়। হ্যাঁ, এ হওয়া সম্ভব ! এ-রকমও হতে পারে, খুবই হতে পারে। ছেলেরা কি বাড়ী থেকে পালায় না ? আখ্‌চার পালাচ্ছে। আর, বাবারা খবর পেয়ে পেছনে পেছনে তাড়া করে' আসবে—সে আর বিচিত্র কি ?

তাহলে এই অধঃপতিত ভদ্রলোক একজন পুত্রবৎসল পিতা মাত্র ! হাওয়ার গতি ফিরে যায়। হাওড়ার মতিগতি ফেরে।

হাওড়া-আমতার মন টলে। জন-মত বদ্‌লায়। সমবেত জনতা লোকটার প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হতে থাকে।

পালে পার্ব্বণে সহপাঠিদের থিয়েটারে অভিনয় করা ছেলের রপ্ত ছিল। অডিয়েন্সকে কি করে' গলাতে হয় তার এক আধটু অভিজ্ঞতা তার ছিল না যে তা নয়। মাহেন্দ্রক্ষণ বুঝে দর্শকদের গদ্‌গদ্ করে দেবার এক ব্রহ্মাস্ত্র সে ছাড়ল এবার ! স্বামী বিবেকানন্দের কায়দায়, দু হাত কোষবদ্ধ করে' মাটির দিকে তাকিয়ে নত মুখে সে বল্ল ঃ

"দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা—আমি বাবার—আমার স্নেহময় পিতার আমি একজন নরাধম পুত্র।"

বাবার ঠোঁটের কোণে হাসির চমক্ খেলে গেল। মুহূর্ত্তের জন্যই কেবল !

শ্রোতারা চঞ্চল হয়ে ওঠে—এযে আস্ত একখানা নাটক দেখা যাচ্ছে ! থিয়েটারের বাইরে এরকম দৃশ্য দেখবার সৌভাগ্য হাওড়া আমতার কল্পনাতেও ছিলনা। নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাত তাদের নাট্যবোধের সূক্ষ্মতায় সুড়সুড়ি দিতে সুরু করেছিল।

এবার বাবার অর্দ্ধোদয় যোগ এল। তাঁর নিজের পার্ট প্লে করবার পালা এল এখন। আস্তে-আস্তে তিনি চোখ খুললেন।

"আমি? আমি কোথায়?" ক্ষীণ-কণ্ঠে তিনি উচ্চারণ করলেন।

এ-রকম অবস্থায় যে-রকম করা দস্তুর—চিরাচরিত প্রথা যা, নিত্যকাল ধরে' মর্ত্ত্যলোকে যা বরাবর হয়ে আস্‌ছে—চৈতন্য-ভ্রষ্ট সেই পূর্ব্বগামী মহাজনদের পথ অনুসরণ করাই তিনি সমীচীন বোধ করলেন।

তারপর কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে ধীরে-ধীরে তিনি নিজেকে তুললেন: "বৎস! পুত্র আমার! অবোধ সন্তান আমার—"

বল্‌তে না বল্‌তে ফের তিনি পড়ে' গেলেন। আবার তাঁর দু'চোখ বুজে এল।

আট

নাটক জমে' উঠেছে, দৃশ্যের পর দৃশ্য—চমক্‌দার দৃশ্য সব—একটার পর একটা উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে, অবলীলাক্রমে হয়ে যাচ্ছে, এবং এইভাবেই চমৎকার চলত যদিনা এমন সময় নিরুদ্দিষ্ট ড্রাইভারটি রঙ্গমঞ্চের মাঝখানে অবতীর্ণ হয়ে—বিচ্ছিরি এক কাণ্ড বাধিয়ে বসতেন।

লোকটার চৈতন্য-সম্পাদনের জন্যে তিনি জলের সন্ধানে গেছলেন। তাঁর ইঞ্জিনের জল টগ্‌বগে গরম—সেই ফুটন্ত জল বদ্‌লোকদের চৈতন্য-সঞ্চারের পক্ষে যথোচিত হলেও ঠিক সেই

ধরণের চৈতন্য-দান করা তখন তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। তিনি কয়লার বাল্‌তিটা করে' পাশের ডোবা থেকে জল কুড়িয়ে এনেছেন। সেই ঘোলা জলে কাদার অংশই বেশি, পানারও অভাব নেই, আর প্রচুর ব্যাঙাচি! এ ছাড়া, বাল্‌তির তলার দিকে কয়লার গুঁড়োর একটা পুরু পলস্তারা জমা ছিল!

এই ধরণের জলযোগে জ্ঞান-ফেরানো চৈতন্যলাভকারীর পক্ষে সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হবে কিনা, এ-সব খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখবার সময় তাঁর ছিল না। তা' ছাড়া, এজাতীয় মার্জ্জিত রুচির কথা ভাববার মতো মেজাজও তাঁর নাই তখন। তাঁর উদ্দেশ্য প্রথমে লোকটার চৈতন্য-সম্পাদন করা, তার পরে প্রশ্ন করা, এ সবের মানে কি? এবং সে মানে যদি মানান্‌-সই না হয়, তাহলে তারপরে পুনরায় অন্য ধরণে তার চৈতন্য-সম্পাদনের ব্যবস্থা করা! (চাই কি, সেই চেষ্টায় পুনরায় যদি তার চৈতন্যলোপ পায় তাতেও ক্ষতি নেই।)

বাল্‌তি-হাতে গট্‌মট্‌ করে' তিনি জনতা ভেদ করে' ঢুক্‌লেম। ইতিমধ্যে জনমত যে একেবারে বদ্‌লে গেছে, এ-বিষয়ে কেউ তাঁকে কিছু বল্‌বার আগেই কাদাটে-পানাটে ব্যাঙাচি-বহুল সেই এক বাল্‌তি জল তিনি ভূপতিত লোকটার মুখের উপর ছুড়ে খালাস করে' দিয়েছেন!

এর ফলে চৈতন্য-সম্পাদন না হয়ে যায় না! বাবাকে উঠে বস্‌তে হোলো। পানাগুলো তাঁর চুলে জড়িয়েছে, গাল বেয়ে কয়লা আর কাদা গড়িয়ে পড়ছে, আর ব্যাঙাচিরা অত্যন্ত বিব্রত বোধ করে' তাঁর কোলের ওপর নাচানাচি লাগিয়ে দিয়েছে।

"বাবা! বাবা!" ছেলে চেঁচিয়ে উঠে বাবার কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। "আমার জন্যেই তোমার এত দুর্দ্দশা!" দু' হাত দিয়ে সে বাবার দেহ থেকে, পানা আর ময়লা, কয়লা আর ব্যাঙাচিদের দূরীভূত কর্‌তে লাগল।

একজন নির্দ্দোষ ভদ্রলোকের প্রতি এ কি-রকম দুর্ব্ব্যবহার! হাওড়া-আমতার যাত্রীরা, এবার ড্রাইভারের ওপর রুখে দাঁড়াল: "এ-রকম করার মানে? মৎলব কি এর···শুনি?"—সবাই জানতে চাইল একবাক্যে।

যে-প্রশ্ন তিনিই নাকি সদ্যচেতন লোকটিকে জিগ্যেস করতে যাবেন, অবিকল সেই প্রশ্নটি তাঁর প্রতিই প্রক্ষিপ্ত হতে দেখে, ড্রাইভারের মেজাজ বিগ্‌ড়ে গেল।

"মানে-টানে হামি জানি না। এক—দুই—তিন বল্‌তে না-বল্‌তে তুমি লোক গাড়ীতে এসে উঠলে তো উঠলে! নইলে সোজা হামি এই খালি গাড়ী লিয়েই সটাং মাঝু চল্লাম। হুম্!"

চড়া গলায় হুকুম জাহির করেই তিনি নিজের ইঞ্জিনে গিয়ে চড়াও হলেন।

এবং হাওড়া-আমতার লোকরাও বিজাতীয় বিরক্তি বিস্মিত হয়ে, উচ্ছ্বসিত বিদ্বেষ ভুলে, কঠোর যত মতামত তখনকার মত

মুলতুবি রেখে, পড়ি-কি-মরি করে' এক দৌড়ে গিয়ে নিজের নিজের জায়গা দখল করে' বস্‌ল।

ছেলে তখন বাবার পঙ্কোদ্ধারে ব্যস্ত, এবং বাবাও ছেলের স্নেহের বহরে এমন মশ্‌গুল যে, ইতিমধ্যে কখন রঙ্গমঞ্চের দৃশ্য বদ্‌লে সম্পূর্ণ পট-পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে, দুজনের কারো সেদিকে নজরই পড়ল না।

দশ

ফাস্‌ট্‌-প্যাসেঞ্জারের গার্ডবাবু গাড়ীর পা-দানিতে দাঁড়িয়ে পতাকা ওড়ালেন কিন্তু পিতাপুত্রের কারো সে দিকে চোখ ছিল না। ড্রাইভার ইঞ্জিনের সানাই ফুঁকে দিল, তার তীব্র আওয়াজেও কোনো কাজ হোলো না। অগত্যা গার্ডবাবু তাদের কাছে গিয়ে বার দুই কাশলেন, গলা খাঁকারি দিলেন, খুট্‌খাট্‌ করলেন কিন্তু কিছুতেই কোনো সুবিধা করতে না পেরে অবশেষে আম্‌তা-আম্‌তা করে বলতে বাধ্য হলেন—"শুনচেন মশাই, আমাদের গাড়ী ছেড়ে দিচ্ছে—"

কিন্তু কে কার কথা শোনে! হারানো পুত্ররত্নকে পুনরায় লাভ করে' বাবার তখন কোনোদিকে খেয়াল নেই।

"বাবা,আমি আর কখনো তোমার অবাধ্য হব না…।"ছেলে বল্‌ছিল।

বাবার সারা মুখে কৃতার্থতা!

"আর কখনো তোমার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করব না!"

বাবার বত্রিশ পাটিতে বিজয়-গৌরব!

"মাপ করবেন, আমাদের গাড়ী ছেড়ে দিচ্ছি। আপনারা

দয়া করে' তাড়াতাড়ি চলে' আসুন !" গার্ডবাবু মাঝখান থেকে বল্‌তে যান।

কিন্তু কে তাঁর কথায় কান দেয় ? ছেলের কথামৃতে বাবার কান জোড়া তখন, অন্য কথায় কর্ণপাত করার ফাঁক্ কই তাঁর ?

"আর কখনো আমি বাড়ী থেকে পালাব না।" ছেলে বলে।

বাবার দুই চোখে আনন্দের দীপ্তি !

"চ' খোকা, আর দেরি করে না, গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে—দেখছিসনে !" বল্‌তে-বল্‌তে বাবার হুঁস্ হয়ঃ "এক্ষুণি হয়ত ছেড়ে দেবে। দেরি করলে আমাদের ফেলে রেখেই চলে' যাবে হয়ত।"

ধূমায়মান গাড়ীর দিকে তাকাতেই যেন তাঁর ঘুম ভাঙে। নন্দনকানন থেকে বাবার পদস্খলন হয়—আবার তিনি ধরিত্রীতে পদার্পণ করেন।

পৃথিবীর মাটিতে পা পড়তেই তিনি উঠে পড়েন, উঠে পড়েই গাড়ীর দিকে ছুট্ লাগান, ছেলেও চট্‌পট্ তাঁর পিছু নেয়।

হাওড়া আমতা ফাস্‌ট-প্যাসেঞ্জারের গার্ডবাবু পতাকা-হাতে, অনেকটা যেন অদৃশ্য মানুষের মতই, তাদের পেছনে-পেছনে আসতে থাকেন।

পতাকা ওড়াবার কথা তিনি ভুলেই গেছেন তখন !

প্রকৃতি-রসিকের সহিত প্রকৃতির রসিকতা

বাস্তবিক, প্রকৃতি-রসিক লোকের অসাধ্য কিছু নেই! নিতান্ত অরসিক প্রকৃতির লোককেও তারা যে কি করে' কত সহজে কাবু করে' ফ্যালে ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। এই আমার কথাই ধরো না! আমি তো একেবারেই প্রকৃতি-রসিক না, প্রকৃতই নই!

প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে বিচলিত হবার পাত্র আমি না! আদত কথা, প্রকৃতির রূপলাবণ্য কোনদিনই আমাকে বিমোহিত করতে পারেনি। আকাশের দিকে, কি গাছপালার পানে, মুগ্ধ হয়ে হাঁ করে' থাকতে আমার একদম্ ভালো লাগে না। বল্‌তে কি, প্রকৃতির প্রতি আমার বিন্দুমাত্র আসক্তি নেই। আমার ধারণা, ওদের চেয়ে ঢের ভালো জিনিষ, চেয়ে দেখবার মত জিনিষ, মানুষের মধ্যে, মানুষের জীবনের মধ্যেই অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ওতোপ্রোতো রয়েছে—তাই দেখলেই যথেষ্ট। তা না, কাছের মানুষ থাক্‌তে, কাছাকাছির লোকালয় ছেড়ে, ঘরের খেয়ে বনের গাছপালা তাড়া করে' বেড়াতে হবে—সে কথা আমার কুষ্ঠিতে কোনোদিন লেখে নি।

প্রকৃতি-রসিক লোকের ওপর আমি হাড়ে চটা।

সেই আমাকেই, আমার মত বেরসিককেই, বনস্পতি বন্দ্যোপাধ্যায় যে কি করে', অতো সহজে কায়দা করে', কুষ্ঠি-বিরুদ্ধ পথে টেনে নিয়ে গেলেন, ভাবলে এখনো আমি অবাক হই।

বলেছি তো, বনস্পতি বাবু এক নম্বরের প্রকৃতি-রসিক। তাঁর লেখা 'প্রকৃতির রাজ্যে পাঁচ রাত্রি' হয়ত তোমরা পড়ে থাকবে। এম্‌নিতে লোকটি চমৎকার, আমারও খুব মন্দ লাগে না, কিন্তু যদি একবার প্রকৃতির বর্ণনায় তিনি মুখ খুলেছেন তা হলেই আর রক্ষা নেই। তিন ঘন্টার জন্যে তুমি গেছ কিম্বা, তাঁর ত্রিসীমানা ছেড়ে পালিয়েছ! প্রকৃতির কথায়, গাছপালার গুণগানে, তিনি পঞ্চমুখ!

এখন, যেদিন আমি পালাতে পারিনি, সেই দুর্দ্দিনের কথাটাই তোমাদের বলি। বনস্পতি এসে আমাকে বললেন, 'চলো, বেশ খাসা এক জায়গায় তোমাকে নিয়ে বেড়িয়ে আসি।'

"কোথায় বলুন তো? কোনো প্রাকৃতিক জায়গা না তো?" ভয়ে ভয়ে আমি প্রশ্ন করি।

"কী যে বলো! পৃথিবীতে তো সবই প্রাকৃতিক! অপ্রাকৃতিক আবার কিছু আছে নাকি? থাকতে পারে নাকি?"

"মানে, যেখানটায় যাওয়া হচ্ছে সেটা একেবারে অপ্রাকৃতিক না হলেও খুব প্রকৃতিসঙ্কুল স্থান কি? মানে, প্রকৃতির ভারে খুব প্রপীড়িত—মানে কি না, প্রকৃতির ভয়ানক প্রাদুর্ভাব আছে কি সেখানে?" ভয়ে আমার মুখ দিয়ে ভালো করে' কথাই বেরয় না।

"থাকলই বা! থাকলে কি? প্রকৃতি তো আর বাঘ নয় যে গপ্‌ করে' ধরে' তোমায় গিলে ফেলবে?"

"তেমন তেমন প্রকৃতি হলে ফেলতেও পারে, বিচিত্র নেই! বাঘও যে বেরুবে না তাও বলা যায় না! প্রকৃতির বুক থেকেই

তো ওরা বেরিয়ে আসে। সেবার আমার সোনামামা সুন্দরবনে গিয়ে প্রকৃতির পাল্লায় পড়ে—বাপস্! কিন্তু মামার ওপর দিয়ে যা গেছে আমার ওপর দিয়ে তা যদি যায়—তার এক ভগ্নাংশ গেলেও আমি আর বাঁচবো না। তার এক পায়ের থাবাতেই আমি কাবার! একটা নখের আঁচড়েই মারা গেছি—আমার দফা রফা!"

"সুন্দরবনে কে যাচ্ছে?" বনস্পতি বাবু বলেন। "আমরা তো যাচ্ছি ডায়মণ্ডহারবারের দিকে। এই কাছাকাছিই তো!"

"কাছাকাছি? তবু ভালো।" অনেকখানি আশ্বস্ত হই। "তা ডায়মণ্ডহারবারের দিকে কেন হঠাৎ? সেখানে আছে কে?"

"বনচিচিঙ্গের খোঁজে যাচ্ছি কিনা!" বনস্পতি বলেন। সঙ্গে সঙ্গে ওঁর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে যায়।

"সে আবার কে? জন্তুজানোয়ার নয় যখন, তবে কি—বনমানুষ—না, আপনার কোন আত্মীয়-টাত্মীয়?"

"শুধু আত্মীয়? আত্মীয় বল্লে খুব সামান্যই বলা হয়। আমার আত্মার আশ্রয়। বনচিচিঙ্গে আর আমি অভিন্নাত্মা।" বনস্পতির আরেক প্রস্থ দীর্ঘনিশ্বাস: "বনচিচিঙ্গের জন্যে যাচ্ছি, ভাবচি, হয়তো রামফিচিঙ্গের সঙ্গেও দেখা হয়ে যেতে পারে।"

ওঁর কথার সুরে যেন আশঙ্কার আভাস আছে।

"ভারী বদ্‌লোক বুঝি? ওই রামফিচিঙ্গেটা?" জিগ্যেস্ করি আমি: "আপনার টাকা ফাকা মেরে পালিয়েছে নাকি?"

আমার একটু আতঙ্কই হয়। কি জানি, এই সব ল্যাঠায়, পরের ছেঁড়া ব্যাপারে, পরস্মৈপদী টাকার তাগাদায় গিয়ে,

বাজে হাঙ্গামায় জড়িয়ে, পরার্থপরতার ঠ্যালা সামলাতে নিজে না বেঘোরে মারা পড়ি!

"রামফিচিঙ্গে টাকা মারবে?" বনস্পতির চোখ বৃহৎ হয়ে ওঠে। "রামফিচিঙ্গে কখনো টাকা মারে না, মারতে পারে না—সে পাত্রই নয় ওরা। রামফিচিঙ্গেদের তুমি চেনো না।"

ওঁর আহত কণ্ঠস্বরে, রামফিচিঙ্গেদের প্রতি অযথা দোষারোপে উনি যে মর্ম্মাহত হয়েছেন, বেশ প্রকাশ পায়।

"রামফিচিঙ্গে যে—আমি কি করে' জানব!" আমি অত্যন্ত অপরাধী হয়ে পড়ি—রামফিচিঙ্গেদের আমি চিনি না সে কথা বাস্তবিক। কিন্তু-কিন্তু হয়ে বলি: "আমি তা বলিনি। আমি ভেবেছিলাম, অন্য কোনো ফ্যাচাঙ্—হয়ত রাম-ফ্যাচাঙ্ কোনো।"

"আহা, কতোদিন ওদের দেখিনি! ওই ফিচিঙ্গে-চিচিঙ্গেদের!" বনস্পতির গোটা মুখ কাব্যময় হয়ে ওঠে: "কখন দেখতে পাব, কতক্ষণে দেখতে পাব, আমার প্রাণ আই-টাই কর্‌ছে।" থেমে থেমে তাঁর অনুযোগ হয়: "তখন থেকে তাদের জন্যে আমি ছট্‌ফট্ করছি!"

ওঁর বাৎসল্যরস উথ্‌লে উঠতেই বুঝতে পারি যে এই ফিচিঙ্গে-যুগল, এই চিচিঙ্গে-ভ্রাতৃদ্বয় আর কিছু না, তাঁরই আত্মীয় কুটুম্বের ভেতরে নাবালকস্থানীয় দুগ্ধপোষ্যদের কেউ। ওঁর দুর্বলস্থানে আঘাত দিয়েছি ভেবে আমার অন্তরে বেদনার সঞ্চার হয়। আমি অনুতপ্ত কণ্ঠে বলি: "বেশ তো, চলুন তাহলে, এখনি বেরিয়ে পড়া যাক্। আর দেরি করে' কাজ নেই।"

ডায়মণ্ডহারবারের বাস্-এ চেপে আমার হুঁস হয়। এতদিন কেন যে উনি এত নিকট আত্মীয়দের (ডায়মণ্ডহারবার এমন আর বেশী দূর কি?) খোঁজ খবর নেননি, ভেবে আমার আশ্চর্য্য লাগে। এক গাদা প্রশ্নপত্র আমার মনের মুদ্রাযন্ত্রে ঝপাঝপ্ ছাপা হতে থাকে, কিন্তু আউট্ করতে সাহস করি না। মনের খট্‌কা মনেই চেপে রাখি, কি জানি, ওঁর দুর্বল হৃদয়ের আবার কোথায় খট্ করে' লেগে যায়।

লোকালয় ছাড়িয়ে, জনমানবশূন্যতার মধ্য দিয়ে, হুস্ হুস্ করে' বাস্ চলেছে—বনস্পতি চিত্রপুত্তলিকার মতো দিক-চক্রবালের দিকে তাকিয়ে, আর আমি?

আমি আর বাস্ তথৈবচ! আমাদের দুজনের অন্তরেই দারুণ আন্দোলন! টাল্ খেতে খেতে চলেছি, দুজনেই।

এমন কি, এই উভয়তঃ আন্দোলনের ধাক্কায়, বাস্ আর আমার মধ্যে এর ভেতরেই বার কয়েক বেশ ঠোকাঠুকি হয়ে গেছে।

এমন সময়ে বনস্পতি বাবু বলে' উঠলেন: "এসো এইবার নেমে পড়া যাক্।"

বলেই, বাস্ থামিয়ে, আমাকে সবলে হস্তগত করে' সেই বিজন বিভুঁয়ের মাঝখানেই এক জায়গায় নেমে পড়লেন ধাঁ করে'।

"এ কোথায় নাম্‌লেন এখানে? এ ধারে তো কোন গ্রাম ট্রাম দেখছিনে?" আমি অবাক্ হয়ে প্রশ্ন করলাম।

"এ আর কতটুক্?' বল্‌তে বল্‌তে তিনি সরকারী পাকা

রাস্তা পেরিয়ে সরাসরি মাঠের মধ্যে নেমে পড়েছেন: "এই মেঠো পথটুকু পার হতে আর কতক্ষণ ?"

বেলা তখন গড়িয়ে আসছে। সন্ধ্যের বেশী বিলম্ব নেই। আল্ ভেঙে, খাল ডিঙ্গিয়ে, টাল্ সাম্‌লাতে সাম্‌লাতে আমরা চলেছি। আগে আগে বনস্পতি, পেছনে পেছনে আমি। ব্যায়রাম আর দুর্লক্ষণ।

"কিন্তু আর একটু হলেই তো চারধার অন্ধকার হয়ে আসবে! তখন কি পথ চিনে পৌঁছনো যাবে ?"

"বাঃ, চাঁদনি রাত না আজ ?" বনস্পতি বাবু ফোঁস করে' উঠলেন: "আজ পূর্ণিমা না ? প্রকৃতির সঙ্গে তো সাত পুরুষেও তোমাদের সম্পর্ক নেই! সাত জন্ম তো গ্যাসের আলোয় সহরে বাস করে' কাটালে! চাঁদের আলোর ধার কেন ধারবে !"

চাঁদের ধার ধারতে বাধা নেই—কেননা সে ধার কখনো শুধতে হয় না, তবু সত্যি বল্‌তে, আজ যে চাঁদনি রাত সে খবর আমার জানা ছিল না।

"ওঃ, আজ পূর্ণিমা নাকি ? চাঁদনি রাত—বটে !" আমি লজ্জিত হয়ে পড়ি।

"চাঁদের আলোয় বনচিচিঙ্গের যা বাহার খুল্‌বে ! আহা !" বনস্পতি উল্লসিত হয়ে উঠলেন।

"কিন্তু ততক্ষণ ওরা জেগে থাক্‌লে হয় ! ছেলে মানুষ তো !" আমি বলি।

"কি—কি বল্লে ? বনচিচিঙ্গেরা ছেলেমানুষ ? কক্ষণো ছেলেমানুষ না। কোনো পুরুষে নয়। কি বল্লে ? বেশী রাত

হলে তারা ঘুমিয়ে পড়বে? কিছুতেই না—প্রাণ গেলেও না। তুমি কিচ্ছু জানো না বনচিচিঙ্গের। রামফিচিঙ্গেদেরও সমস্ত রহস্য তোমার অজানা। ঘুমোবার ওরা পাত্র নয়—রাত্রে ওরা ঘুমোয় না,—রাত্রেই ওরা চারধার গুলজার করে! চাঁদের আলোতেই ওদের বেশী ফূর্ত্তি!···ছি—ছি—ছি! যা বলেছ, বলেছ, আর বোলো না কখনো। অমন কথা মুখেও এনো না আর।"

সারা রাত গুলজার করে' দস্যিপনা করা—এ কি ছেলে-পিলেরে বাবা? অনেক কথাই মুখে আসে—কিন্তু শ্রীমুখের এ ধারে আনতে সাহস পাই না।

"তুমি কী ভেবেছ বনচিচিঙ্গেদের? শুনি একবার?" হঠাৎ কী যেন এক সন্দেহ ওঁকে ধাক্কা লাগায়—কোন্ এক অন্তর্গত সংশয়ে উনি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন।

"খুব ভালো ছেলে ভাবতে পারছিনে।" আমি শুধু বলি।

"হায় হায়! ছেলে নয়, ছেলেই নয়! বনচিচিঙ্গে এক রকম ফুল! জলের ধারে ফোটে, পুকুরের পাড়ে-টাড়ে! কিন্তু সব জায়গায় ফোটে না। কত জায়গাতেই তো গেছি, কত দেশেই না! কত পুকুরই তো চষ্‌লাম, কিন্তু কোথ্‌থাও ওদের দেখিনি! কেবল সেই এক জায়গায় দেখেছিলাম, দোতলা সেই ডাকবাংলোর গায়ে লাগা এক পুকুরের ধারে। সেইখানেই যাচ্ছি আমরা।"

"বনচিচিঙ্গে এক রকম ফুল!" আমি আকাশ থেকে আছাড় খাই।

"রামফিচিঙ্গেও আরেক রকমের ফুল! সেও জলের ধারেই

ফোটে, কিন্তু সব সময়ে নয়। সেই ডাকবাংলোর পুকুরেও তাদের আমি কদাচই ফুটতে দেখেছি।"

"রামফিচিঙ্গে আবার আরেক রকমের—?" দূরাগত ধ্বনির মতো বনস্পতির কথাগুলো আমার কানে এসে লাগে। আমার নিজেকে তৃতীয় আরেক রকমের ফুল বলে' আমার ধারণা হয়।

"তাহলে আমরা এখন যাচ্ছি কোথায়?" অনেকক্ষণ বাদে ক্ষীণস্বরে আমার গলা থেকে বেরয়।

"কোথায় আবার? সেই বনচিচিঙ্গের অন্বেষণে। সাম্‌নের এই সামান্য জঙ্গলটা পেরুলেই —"

"না, জঙ্গলের মধ্যে আমি পা দেব না।" আমি রুখে দাঁড়াই। "আমার সোনা মামা—" উদাহরণ দিয়ে আমার বক্তব্যটা বিশদ করতে যাই কিন্তু অব্যক্ত ভাবাবেগে আমার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে। চার চারটে থাবালো পা আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে ডিঙ্গিয়ে যাচ্ছে, স্পষ্ট আমার মানসপটে ভাস্‌তে থাকে।

"ফের আবার শোনা-মামা?" বনস্পতিবাবু ধম্‌কে ওঠেন: "কেন, ছাখা-মামাকে কি চোখের সাম্‌নে দেখতে পাচ্ছ না যাদু? আমি কি তোমার সঙ্গে নেই? তবে আবার ভয় কিসের?"

ভয় কিসের তা ভগবানই জানেন। আমার দু' চোখ দিয়ে দর দর করে' ভরা ভাদর নামে।

"ছিঃ! কান্না কেন? তেমন ঘোর জঙ্গল না। তেমন কিছু অরণ্যানী নয়! হিমালয়ের পাদদেশে গহন পার্ব্বত্য উপত্যকায়, আরণ্যক-জীবনে যা সব সাংঘাতিক চীজ দেখেছি তার কাছে কোনো অংশে লাগে না!" বনস্পতি আমাকে

সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করতে চান—এমন কি, আমার দরবিগলিত ধারায় তাঁর একখানা ময়লা রুমাল পর্য্যন্ত লাগাতে অগ্রসর হয়। "একে বনও বল্‌তে পারো, আবার বাগানও বলা যায়। একটা আম বাগান।"

বল্‌তে কি, আম বাগান শুনে যা আনন্দ পেলাম, জীবনে আর কোনোকিছুতেই তা পাইনি, এমনকি, আস্ত আসল আম খেয়েও এতখানি আরাম কখনো হয়নি।

"ওঃ! আমবাগান! তাই বলুন্!" আমি চোখ মুছতে থাকি—তাঁর রুমালের অপেক্ষা রাখি না। "আপনি যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন, বাবা!"

বল্‌তে বল্‌তে কয়েক মুহূর্ত্তেই আমরা সেই ছোট্ট আমবাগানটি এফোঁড় ওফোঁড় করে' বেরিয়ে পড়লাম। আর অন্ধকারও এদিকে বেশ ঘোর হয়ে ঘনিয়ে এল।

বনস্পতিবাবু বল্লেন: "আর এগিয়ে কাজ নেই। এসো, এইখানে একটু বসা যাক্। এই ঢিবিটার ওপরে। এক্ষুনি চাঁদ উঠবে, একটু পরেই তো উঠে পড়বে। পূর্ণিমার এক থালা চাঁদ! চাঁদনি আলোয় পথ চল্‌তে যা মজা! আঃ!"

ঢিবির ওপরে বসে বসে বনস্পতিবাবুর বাসনা স্ফুরিত হতে থাকে: "আহা, কতক্ষণে যে গিয়ে পৌঁছব! সেই ডাক-বাংলোটার কথা ভাবতেই আমার জিভে জল আস্‌চে! আর তার গায়ে লাগা সেই পুষ্করিণী! চিরদিনের জন্যে লাগানো। আঃ, তার জল কি ঠাণ্ডা! সেই ডাকবাংলোর দোতলার জানালা থেকে কতো বার যে তার বুকে ঝাঁপ খেয়েছি! সাঁতার

কেটেছি কতো! ধারে ধারে থোপা থোপা বনচিচিঙ্গে ফুটে রয়েছে! কোথাও কোথাও রামচিচিঙ্গে! আর মাঝে মাঝে ভূত ভ্যারেণ্ডা! আঃ, আঁৎকে উঠো না! কোনো ভূত প্রেত নয়, এক রকমের ফুল। জলের মধ্যে ফোটে। পদ্ম-জাতীয়, এক রকমের জলচর ফুল হচ্ছে তোমার ভূত ভ্যারেণ্ডা; না, না, মানুষে যে ভ্যারেণ্ডা ভাজে সে ভ্যারেণ্ডা না! সে ভ্যারেণ্ডা কেন হবে, কেন হতে যাবে?…"

বক্‌তে বক্‌তে হঠাৎ তাঁর টনক্ নড়েঃ "য়্যাঁ, চাঁদ উঠছে না কেন হে? এতখানি রাত হয়ে গেল, পূর্ণিমা, তবু চাঁদ উঠছে না? এ রকম প্রকৃতিবিরুদ্ধ ব্যাপার তো কখনো দেখিনি; এ কি কাণ্ড? কই, আকাশে তো কোনো মেঘ টেঘ নেই, পরিষ্কার আকাশ! তবে, তাহলে, চাঁদের এরকম দুর্ব্ব্যবহার কেন?"

আকাশপানে মুখ তুলে বোধ করি, দুর্ব্ব্যবহারকারী চাঁদের উদ্দেশেই সুতীক্ষ্ণ প্রশ্নটা তিনি নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু অন্য তরফ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। অনেক করে' অনেকক্ষণ ধ'রে অনেক কড়া সমালোচনা করেও, কিছুতেই চাঁদকে ওঠানো গেল না।

"আর বসে কি হবে?" বনস্পতিবাবু উঠে পড়লেন: "চাঁদ আর উঠবে না। নিশ্চয় কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। চলো, একটু একটু ক'রে পা চালিয়ে যাওয়া যাক্। খানিকটা এগিয়েই একটা গ্রাম আছে—এই বাগানটা পেরিয়ে একটু পূব মুখো গেলেই। তার মাইলটাক্ পরে আর একটা বড় গ্রাম, সেই

গ্রামের সীমান্তেই সেই ডাকবাংলো। একেবারে শেষ প্রান্তে। এমন কিছু বেশী দূর না। বেশ বেড়াতে বেড়াতে চলে যাওয়া যাবে। হাওয়া খেতে খেতেই পৌঁছে যাবো।”

কিন্তু এগুবো কোন্ দিকে? কোন্‌টাই বা পূব দিক? যা ঘুট্‌ঘুট্টি অন্ধকার! পূর্ণিমা রাতে এতখানি অন্ধকার আমি এর আগে আর কখনো দেখিনি। ইচ্ছা হোলো, বনস্পতি-বাবুকে একবার জিগ্যেস করি, এমন তো হয়নি যে, এ-আর-পির কর্ত্তারা বিমান-আক্রমণের ভয়ে, ব্ল্যাকআউটের খাতিরে চাঁদকে ঢাকা দিয়ে রেখেছেন? নইলে পূর্ণিমা রাত্রে চাঁদের পাত্তা নেই, এমন তো কদাপি হয় না! চাঁদ তো বিশ্বাসঘাতক নয়। তার এতখানি কর্ত্তব্যশৈথিল্য ভাবতে পারাও কঠিন!

অতি কষ্টে হাৎড়ে মাৎড়ে কোনো রকমে তো গ্রামের মধ্যে গিয়ে পৌঁছলাম। একজন লোককে টিম্‌টিমে একট আলো নিয়ে আস্‌তে দেখা গেল।

বনস্পতিবাবু তাকে ডেকে,—না ডাকবাংলোর নয়···চাঁদের কথা জানতে চাইলেন। প্রথমেই চাঁদের খবর!

বিস্তর বাগাড়ম্বর করে' সে যা জবাব দিল তার মোদ্দা কথা এই,—চাঁদ বলে কেউ তাদের গ্রামে থাকে না। অন্ততঃ এখন থাকে না। ছিল তিনজন, কিন্তু তারা একে একে কেটে পড়েছে,—একজন বিদেশে চাক্‌রি নিয়ে, আরেকজন ওলাউঠায়, আর তিন নম্বর চাঁদ কিছুদিন আগে তার ফুফাকে খুন্ করে' ফেরার!

পর পর তিনজন চাঁদের কীর্ত্তিকলাপ বিস্তারিত শুন্‌তে

বাধ্য হয়ে বনস্পতিবাবু বিরক্ত হয়ে এমন গুম হয়ে গেলেন যে সে লোকটির কাছে আর কোনো কথা জান্‌তেই চাইলেন না।

টিম্‌টিমে-আলো-হাতে আমাদের নিষ্কৃতি দিয়ে চলে গেলে পর, লাঠি লাঠি ঠক্ ঠক্ করতে করতে আরেকজন সেই পথে এল।

"মশাই, আজ চাঁদ ওঠেনি কেন বলতে পারেন?" জিগ্যেস করলেন বনস্পতিবাবু।

"চাঁদ ওঠেনি তার আমি কি জানি? আমি কি চাঁদের গার্জ্জেন্—যে তার ওঠা না ওঠার খবর রাখব? তার কৈফিয়ৎ কি আমি দেব?"

বনস্পতিবাবু চুপ্ হয়ে গেলেন। আর দ্বিতীয় কথাটি নেই। দেখতে দেখতে সেই লাঠি-ঠক্‌ঠকানো চলে গেল, তাঁর ঠক্‌ঠকানির প্রতিধ্বনিও মিলিয়ে এল।

তারপরে আরেকজন লোককে দেখা গেল, ছাতা মাথায়। সেই অন্ধকারের আব্‌ছায়াতেও দেখতে কষ্ট হোলো না। বিনা রোদে বর্ষাতেও এই রাত্রিকালে তাঁর মাথায় ছাতা কেন আমরা ভেবে পেলাম না।

ছত্রপতি এই তৃতীয় ব্যক্তিকে কোনো কথা জিগ্যেস করবার বনস্পতিবাবুর সাহসে কুলোলো না। ভদ্রলোকের পাশ দিয়ে যাবার কালে তিনি কেবল আপন মনে বল্‌লেন: "পূর্ণিমা রাত্রে চাঁদ নেই, ভারী আশ্চর্য্য!"

এবং আমি কথাটাতে জোর দেবার জন্যে বলে উঠলাম: "ঘোর কলি! ঘোর কলি!!" সমস্যাটাকে আরো সবল করতে চাইলাম।

ছাতা মাথায় লোকটি দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর অস্ফুটধ্বনি থেকে বোঝা গেল, তিনিও আশ্চর্য্যান্বিত হয়েই দাঁড়িয়েছেন।

"আজ পূর্ণিমা কি বল্‌ছেন মশাই? আজ—আজ—আজ যে অমাবস্যা!"

তখন আমার মনে কী ইচ্ছা হোলো বল্‌বো? ইচ্ছে হোলো, প্রকৃতি-রসিক বনস্পতির গালে সজোরে এক চড় বসিয়ে দিই! সমস্ত প্রাকৃতিক রস এক চপেটাঘাতে বার করে' আনি ওঁর। কিন্তু, অন্ধকারে, হাত ফস্‌কে কাকে মার্‌তে কাকে মেরে বস্‌ব, দেখতে না পেয়ে দৈবাৎ সেই ছাতাওলাকে কিম্বা আমার নিজেকেই বেমালুম হয়ত চড়িয়ে দেব, এই ভেবে উদ্যত হাত সরিয়ে রাখলাম।

বনস্পতিবাবু ভগ্নকণ্ঠে বল্লেন: "আজ অমাবস্যা! ওঃ, তাইতো বলি, কেন চাঁদ উঠছে না! তাহলে আর চাঁদের—চাঁদের দোষ কি, বলুন? যাক্‌গে, না উঠল চাঁদ বয়েই গেল! আচ্ছা, এই যে রাস্তাটা দেখছেন যা ধরে আমরা চলেছি, এ কোথায় শেষ হয়েছে জানেন? এর অপর প্রান্তে কি আছে বলতে পারেন?"

"হুঁ। পারি বইকি। ভারত মহাসাগর।"

আমি দ্বিতীয়বার অতিকষ্টে আত্মসম্বরণ করলাম। হাত তো বটেই!

সেই রাত্রে, কতখানি দুর্ভোগের পর, কি কি ফাঁড়া কাটিয়ে অবশেষে বনস্পতিবাঞ্ছিত সেই ডাকবাংলোয় গিয়ে পৌঁছানো গেল, তার বিস্তৃত ইতিহাস নাই বল্লাম।

দোতলার একটি ঘরে স্প্রিংএর খাটে বিলম্বিত হয়ে আরামের দীর্ঘনিশ্বাসটি ছেড়েছি—আঃ! আর কিছুই চাই না। একখানি লম্বা ঘুম! এক কাঁড়ি ঘুম কেবল! আর এর ভেতরে যদি এক হাঁড়ি গরম মুর্গীর মাংস এসে যায় তাহলে তো কথাই নেই!

ঘুমে দু'চোখ জুড়ে আসছে। স্বস্তির নিশ্বাসটি ফেলেছি আর অমনি ওপাশের স্প্রিংয়ের খাট থেকে বনস্পতির কলকণ্ঠ কানে এল।

"...এই সেই ঘর! ওই সেই জানালা! ওই জানালা থেকে আমি ডাইভ্ খেতুম! আর সাঁতার কাটতুম এর গা-লাগা নীচের পুকুরে। আঃ, কি ঠাণ্ডা জল পুকুরটার, আমার সাঁতার কাট্‌তে ইচ্ছে করছে! শুনচ হে?"

আমি অতি কষ্টে চোখ মেললুম। উনি শোননি তখনো, তখনও নিজের খাটে বসে'। "কাল সকালে কাটবেন এখন যতো খুসি।" এই বল্লাম কেবল।

ইচ্ছা করছিল গিয়ে ঘাড় ধরে' ওঁকে শুইয়ে দিই, বিছানার ওপরে যদ্দূর সাধ্য, সোজা করে' দিই, কিন্তু এখন আর কষ্ট করে' ওঠা সম্ভব নয়। সেই যখন খাবার তৈরি হয়ে আসবে, তখন তো ফের আবার কায়ক্লেশে উঠতে হবে—মাঝখানে একটু ঘুমিয়ে নেওয়া দরকার।

"শুন্‌চ? শুন্‌তে পাচ্চ?" বনস্পতি কান খাড়া করে' বল্লেন: "কি, শুন্‌তে পাচ্চ না?"

"কই, কিছু না তো!" আমি এবার চোখ বুজেই জবাব দিলাম।

"কুলু কুলু ধ্বনি শুনতে পাচ্চ না? পুষ্করণীর কুলুকুলুনাদ?" বনস্পতি উৎসাহের আতিশয্যে দাঁড়িয়ে ওঠেচেন। চোখ না খুলেও দেখতে পাওয়া যায়।

তখন, বাধ্য হয়েই আমাকে উঠে বসতে হোলো। পুষ্করণীর কুলু কুলু ধ্বনি? এ কি কথা, য়্যাঁ? এতো ভালো কথা নয়।

বনস্পতি আস্ত একটা প্রকৃতি-রসিক, আমার চোখ খুলে যায়, বাস্তবিক! যে ব্যক্তি অমাবস্যায় চাঁদ আর আমবাগানের মধ্যে অরণ্যানী ছাখে, সে যে পুষ্করণীর কুলু কুলু ধ্বনি শুনবে তা আর বেশী কি? সত্যি, এই সব প্রকৃতির পোষ্যপুত্ররা সব পারে।

"ওই! ওই! পুষ্করণী কুলু কুলু স্বরে আমাকে ডাক্‌ছে! বলছে, আয় বাছা, আয় আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়! কতোদিন আসিস্‌নি! আয়, সাঁতার কাট্! তোর সর্ব্বাঙ্গ জুড়িয়ে দিই আয়! বনচিচিঙ্গের গন্ধ পাচ্ছি আমি! এখানে বসেই পাচ্ছি। কী মিষ্টি গন্ধ, আঃ!"

অনেকক্ষণ ধরে ঘরের কোণ থেকে ইঁদুরপচা গন্ধের মতো একটা চিম্‌সে দুর্গন্ধ নাকে আসছিল—এই কি তবে সেই বনচিচিঙ্গের সৌরভ নাকি?

বনস্পতিবাবু জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ান। "চাঁদনি রাত হলে, কী ভালোই হোতো আজ! কী আরামেই সাঁতার কাটা যেত—আহা! যাক্, অন্ধকারেও মন্দ হবে না। বনচিচিঙ্গেদের দেখ্‌তে না পাই, শুঁক্‌তে পাবো তো! নাক দিয়ে তো টের পাব!..."

বলতে বলতে, তিনি জানালার ওপরে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছেন। এবং আমি হাঁ হাঁ…করে' উঠতে না উঠতে, পরমুহূর্ত্তেই নিজেকে তিনি জলাঞ্জলি দিয়ে বসেছেন।

'ঢি—প্!' পুষ্করণীর গর্ভ থেকে নিদারুণ এক আওয়াজ বেরিয়ে এল!

কুলু কুলু ধ্বনির জন্যে কাণখাড়া করিনি বটে, কিন্তু এই ঢিপের জন্যও আমি প্রস্তুত ছিলাম না। এবার আমাকে সচকিত হতে হোলো। বনস্পতি জলে পড়লেন, অথচ, ঢিপ্ করে' একটা আওয়াজ এল কেন? জলে পড়লে তো এমন শব্দ হয় না!

অতখানি উঁচু থেকে, বনস্পতির মতো, ভারীক্কী একটা মানুষের আকস্মিক জলযোগ ঘটলে তুমুল ছল-ছল ধ্বনি ওঠবার কথা, কিন্তু তা না হয়ে শুধু একটা ঢিপ্ শুনলাম যেন—এই ঢিপ্কারধ্বনি কেন? পুষ্করণীর এ আবার কোনদেশী ছলনা? ছলনাময়ী শ্রীমতী প্রকৃতির এ আবার কী লীলাখেলা?

হাঁকাহাঁকি করে' বাংলোর বাবুর্চ্চি আর মালীকে ডেকে আনা হোলো! বনস্পতিবাবুর হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে ডাইভ্ খাওয়ার কথাটা জানালাম ওদের।

শুনেই তো বাবুর্চ্চি আর মালী ভোঁ দৌড়! একটু পরেই দুজনে মিলে ধরাধরি করে' বনস্পতিকে তুলে নিয়ে এসে স্প্রিংয়ের খাটে শুইয়ে দিলে। এবং বাচ্চা-বেয়ারাটা ডাক্তার ডাকতে ছুটে গেল।

বনস্পতি তো অচৈতন্য, কিন্তু কী আশ্চর্য্য, জলের গর্ভে ঝাপ্

দিয়ে এসেও তাঁর গায়ে এক ফোঁটা জল লাগে নি—জামা কাপড় ডাহা শুক্‌নো। ঠিক বাংলা ফিল্‌মের নায়করা বাদলায় ভেজার কিম্বা সাঁতরে এসে ওঠার পরমুহূর্ত্তেই যেরকম ওদের খট্‌খটে দেখা যায়, অবিকল!

"তা বাবুটি এমন করে' ক্ষেপে গেলেন কেন হঠাৎ?" জিগ্যেস করল ওরা।

"ওঁর সাঁতার কাটবার সখ জাগল কি না!" আমি খুব ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলি: "আর এর গা-লাগা ঠিক নীচেই তো পুকুর! তোমরাই লাগিয়ে রেখেচ। ওঁর আর দোষ কি?"

"য়্যাঁ, বলেন কি? এখন তো ওখানে আর পুকুর নেই।" মালী-বাবাজী দুচোখ কপালে তুলে বললে: "ছিল আগে। কিন্তু বছর তিনেক হোলো' জেলার হাকিম যখন সফরে এলেন তখন এই বাংলোতেই এসে উঠলেন কিনা! তাঁর খাতিরেই পচা ডোবাটা বুজিয়ে ফেলে, তাঁর টেনিস খেলবার জন্যে—"

"উঁহু, টেনিস্ না টেনিসন। টেনিসন্ খেলা!" বাবুর্চ্চির ইংরেজীতে; বিশেষ করে ইংরেজী-সাহিত্যে, অভিজ্ঞতার বেশ গভীরতা আছে এই এক বাক্যেই তার পরিচয় পাওয়া যায়।

"তাঁর সেই টেনিসন-খেলার জন্যে শান্ বাঁধানো—কি বলে গিয়ে—" মালী এবার অযাচিত ভাবেই বাবুর্চ্চির মুখাপেক্ষা করে: "—???—"

"টেনিসনের হার্ড কোর্ট।" বাবুর্চ্চি মুরুব্বির মত মাথা নাড়ে: "কোর্টের হাকিম কিনা। যেখানেই যান্ না কেন

কোর্ট তাঁর চাই—তাঁর কোর্ট বজায় থাকা চাই। গায়েও ইয়া ভারী একখানা যা পরে এসেছিলেন!"

কী সর্ব্বনাশ! হার্ডকোর্টের সংঘর্ষে, বনস্পতিবাবু এতক্ষণে বনচিচিঙ্গে বনে' যান্‌নি তো? ভূত ভ্যারেণ্ডার খোঁজে বেরিয়ে নিজের ভ্যারেণ্ডা ভাজতে নিজেই ভূত হয়ে—কি বলে গিয়ে—রাম শিঙে—উঁহুঁ—তাঁর রামফিচিঙ্গে ফুঁকে বসেননি তো!

"ঐ বাবুটি বোধ হয় আগে আমাদের এখানে আস্‌তেন?" বাবুর্চ্চি আমাকে জিজ্ঞেস করেঃ "আমাদের পুরণো মক্কেল বোধ হয়?"

"নিশ্চয় অনেক দিন আগে।" মালীই আমার হয়ে জবাব যোগায়ঃ "নইলে পুকুরের খবর জানলেন কি করে'?"

"পচা ডোবাটা তখন খুব পাঁকাল মাছে ভর্ত্তি ছিল!" বাবুর্চ্চি দুঃখ করে' বলেঃ "এখন তো খট্‌খটে! বুজিয়ে দিয়ে কি হয়েছে? একদম্ বাজে!"

মালী আপত্তি করেঃ "বুজিয়ে দিয়েছে ভালোই করেছে। ছিল তো চারধারে কেবল জঙ্গল আর অ্যাস্‌সাওড়ার ঝোপ্! আর কী মার্‌মার্ মশা রে বাপ্!"

"কেন কী সব ফুল ফুট্‌ত না কি!" আমার মনে পড়ে হঠাৎ "পুকুরটার আশে পাশে আহামরি কী সব ফুল ফুট্‌ত না?"

"অ্যাস্‌সাওড়া গাছে ফুল ফুট্‌তে তো কখনো দেখিনি বাবু! তবে কেউ কেউ নাকি ভূত দেখতে পেয়েছে শুনেছি!" মালী বলে।

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ভূত ভ্যারেণ্ডা!" আমি ওকে সায় দিই।

ডাক্তার এসে, ভালো করে' দেখে শুনে জানালেন : "বড্ড ফাঁড়াটা কেটে গেছে! মাথার্ ওপরে পড়েছিলেন বলেই বেঁচে গেলেন এ যাত্রা! নইলে হাত পার ওপরে নাম্‌লে আর রক্ষে ছিল না! হাত পা তো যেতই, জীবন-সঙ্কটের পর্য্যন্ত সম্ভাবনা ছিল!

"মাথার খুলির কিছু হয়নি তো?" ভয়ে ভয়ে আমি জিগ্যেস করি।

"কিস্সু না" ডাক্তারবাবুটিবললেন : "পরীক্ষা করে' দেখলাম ওঁর খুলিটা এমনিতেই একটু মোটা। বেশ একটু থিক্। এবং সেইখানেই বাঁচোয়া। তবে এই ভয়, এহেন ধাক্কায়, হয়ত ঘিলু জমে গিয়ে খুলিটা আরো বেশ একটু মোটা হয়ে যেতে পারে।"

বনস্পতিবাবু, প্রকৃতির সেই রসিকতার পর, সেরে উঠে ভালোয় ভালোয় কলকাতায় ফিরেছেন। এবং তারপরে 'প্রকৃতির মার্প্যাচ্' বলে' কি একখানা বইও নাকি লিখেছেন। এবং শুনেছি, তারপর থেকে তিনি আরো ঢের ভালো লিখছেন। তাঁর হাত খুলে গেছে। মাথার খুলি জমে গিয়ে মাথাও খুলে গেছে বোধহয়।

যদুবংশ কেন ধ্বংস হোলো ?

শ্যামবাজারের এক রেস্তরাঁয় বসে আছি এক বিকেলে, এমন সময়ে আমাদের হৃষীকেশ হেল্‌তে দুল্‌তে এসে হাজির। সশরীরে একেবারে আমার সম্মুখের চেয়ারটাতেই !

"আরে, হৃষীকেশ যে !" বল্লাম আমি ; তার দর্শনলাভে উল্লসিত হবার কোনো অভিনয় না করেই আমি বল্লাম। সত্যি কথা বল্‌তে, টোস্‌টের ওপরে ডিমের পোচ কিভাবে সুবিস্তৃত হচ্ছে তখন তাই আমার একমাত্র দ্রষ্টব্য ছিল—ও ছাড়া আমার চোখের সামনে অন্য কিছু দেখবার লালসা তখন আমার ছিল না।

"এই যে !" বলে হৃষীকেশ খালি চেয়ারটার কাণায় কাণায় জমাট হয়ে বস্‌ল। "তারপর ? কাগজে পড়োনি নাকি ?"—এই বলে' পোচের ওপর দিয়ে প্রসারিত হয়ে কানের কাছাকাছি এসে ফিস্‌ফিস্‌ করল হৃষীকেশ : "রাস্তাঘাটে এধারে ওধারে চারধারেই ফিফ্‌থ্‌ কলম্‌রা গিস্‌গিস্‌ করচে যে ! জানো না নাকি ?"

"জানিনে, মানে ?" পোচের আওতা থেকে যতটা সম্ভব ওকে দূরে রেখে আমি জানালাম : "এখানে বসেই পাচ্ছি। এই রেস্তরাঁতেই। আমার পরে এসে আমার আগে খাদ্যলাভ করে চলে যাচ্ছে। স্বচক্ষেই তো দেখচি !"

"এইখেনে ? এই রেস্তারাঁতেও ?···পঞ্চমবাহিনী ?" চোখ বড় বড় করে' হৃষীকেশ একটু নড়ে বস্‌ল।

"কেন, ঐ 'বয়'দেরই ছাখো না ! আধঘণ্টা ধরে তলব করে' টোস্‌ট্‌ পেলাম। তারপরে পনের মিনিট ধরে চেঁচামেচি করে এই পোচ্‌ পেয়েচি—তারপর কতক্ষণ থেকে চায়ের জন্যে ইসারা ইঙ্গিত কর্‌চি কিন্তু কেউ গ্রাহ্য কর্‌চে কি ?"

"এরা—এরা পঞ্চমবাহিনী ?" ওর হাব ভাব দেখে মনে হয় নিজের চক্ষুকর্ণকেও বিশ্বাস করতে পারছে না।

"তা না তো কি ? কোন্‌ বাহিনী তবে ?···এদের পুলিসে ধরিয়ে দেয়া যায় ?"

"উঁহু। এরা নয়। আসল পঞ্চমবাহিনী।" হৃষীকেশ এবার নিজের মুখ পোচের সম্মুখে না এনে—একটা পোচকেই নিজের মুখের ওপরে টেনে নিল।

"বর্ম্মার আম্‌দানী। একেবারে খাঁটি জিনিস। রেঙ্গুনের পতনের মূলে যারা—খবরের কাগজে পড়োনি ? সেই যারা আকাশে টর্চ্চ ফেলে জাপানী বোমারুদের ডেকে আন্‌ত হে !"

"য়্যাঁ ? বলো কি ?" আমার হাঁ থেকে আধখানা পোচালো টোস্‌ট্‌ টেবিলের ওপরে পড়ে যায়—রেমান্থনের বিধি অমান্য করেই।

"হ্যাঁ, তবে আর বল্‌ছি কি ! সেই সব টর্চ্চার—কিম্বা টর্চ্চারার্‌—যাই বলো !" চর্ব্বিত চর্ব্বণের সাথে সাথে হৃষীকেশ উদ্গীরণ করে: "আমাদের যাদবপুরের দিকটাতেই বেশী আরো।"

"যাদবপুর ! আরে, যেখানে যে আমার এক মামারা থাকেন !" টেবিলে না-পড়া পোচের বাকী অর্দ্ধেক আমার মাথায় উঠে যায়।—"কী সর্ব্বনাশ !"

"সর্ব্বনাশ বল্‌তে। তোমার তো মামারা থাকেন, আমার আবার মামার ভাগ্‌নেরা সেখানে আছে।" বল্‌তে না বল্‌তে আমার বিস্ফারিত চোখের ওপরেই হৃষীকেশ আমার প্লেট্‌টাকে ফাঁক করে আনে—টোস্‌টালো পোচের বাকী অংশকেও বেশীক্ষণ কারো মুখাপেক্ষা করতে হয় না।—"আমরাই থাকি কিনা সেখানে !"

হৃষীকেশের মামার ভাগ্‌নেদের—ওদের একজনের কার্য্য-কলাপ দেখেই আমার চোখ কপালে ওঠে।

"তাহলে উপায় ? কী কর্ত্তব্য তাহলে ?" আমি জিজ্ঞেস করি : "পুলিসে খবর—?"

"পুলিস ? পুলিসে কতোদিক সাম্‌লাবে ? এই যুদ্ধের হিড়িকে চার ধারে কতো তাল তাদের রাখতে হচ্চে, তার ওপরে যাদবপুরের স্থানীয় সমস্যা তাদের ঘাড়ে চাপানো কি উচিৎ হবে ? তার চেয়ে এসো, আমরা নিজেরাই সবাই মিলে এর বিহিত করি। একটা নগররক্ষী সমিতি গঠন ক'রে ফেলা যাক্।"

হৃষীকেশ ঐরকমই ! সমিতি বা সঙ্ঘ গড়বার এমন ভীষণ ওর বাতিক যে কোনো কিছুর একটা ছুতো একবার পেলে হয়!

ফুটবল-দর্শক-সমিতি, সর্ব্বদা-রাস্তার-বাঁদিক-দিয়ে-হণ্টনকারী-সঙ্ঘ, শব্দচক্র প্রতিযোগিতায়-যোগদানকারী-দল—এম্‌নি অনেক সঙ্ঘ-সমিতির ও জন্মদাতা। এমন কি, দৈনিক পত্রে ছাপবার জন্য নিয়মিত যারা চিঠি পাঠায় তাদের নিয়ে পত্র-প্রেরক সমিতি বলেও কী নাকি একটা ও খাড়া করেছিল—কিন্তু সংবাদপত্র-সম্পাদকের সহযোগিতার কার্পণ্যে সমিতিটা অবশেষে চিৎপাত হয়ে পড়ল। কোনো রকমে কিছু করেই খাড়া রাখা গেল না।

মাঝখানে সাবধানী-পথিকসঙ্ঘ নামে আরেকটা কী নাকি ও গড়তে গেছল—তার উদ্দেশ্য ছিল পিক্‌পকেটের কাঁচির থেকে ট্যাঁক বাঁচিয়ে চলা—অবাঞ্ছিত হস্তার্পণ থেকে আত্মরক্ষা করে' কি করে' সাবধানে পথে ঘাটে ঘোরাফেরা করা যায় তার জাজ্জ্বল্যমান্ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করাই ছিল সদস্যদের একমাত্র কাজ। এই কারণে তাদের জামার বক্ষস্থলে তিনরঙা ব্যাজ লাগানো থাকৃত—যাতে চলমান উদাহরণরা সহজেই সবাইকার নজরে পড়ে। প্রথম প্রথম পিক্‌পকেটরা আপত্তি করেছিল—হৃষীকেশকে ঘোরতর ভাবে শাসিয়ে দিয়েছিল পর্য্যন্ত। উড়োচিঠি ছেড়ে নোটিশ দিয়েছিল—এরকম করা ভালো হচ্ছে না। এরকম করলে তারা হৃষীকেশের, কেবল পকেট নয়, জামার হাতা পর্য্যন্ত কেটে নেবে—এমনকি হাতার ভেতরে হাত থাকলেও দৃক্‌পাত করবে না। হৃষীকেশ তবু পেছয়নি, ভয় খাবার ছেলে নয় সে, কিন্তু শেষটায় সাবধানী পথিকরাই সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এসে এলো-

পাথাড়ি ঠ্যাঙাতে সুরু করে' দিল। না, কোনো পিক্-পকেটকে নয়,—খোদ্ হৃষীকেশকেই।

কারণ ? পিক্‌পকেটদের অসুবিধা সৃষ্টির জন্যে দল গড়া হলেও ওতেই ওদের খুব সুবিধা হয়ে গেল। জম্‌কালো মেঘের ভেতর থেকে চম্‌কানো রৌপ্য-রেখারা স্পষ্টতর হয়ে দেখা দিতে লাগল। পকেট তো সবারই থাকে, কিন্তু সব পকেটে সব আর থাকে কি ? কজনের পকেট আর ট্যাক্‌শাল বলো ? অনেকেরই তো গড়ের মাঠ,—এই আমার যেমন। সে সব পকেট থেকেও নেই, পকেটের ছলনামাত্র। সেই সব নামমাত্র পকেটে হস্তক্ষেপ করে' বদনাম কেনার দায় থেকে পিক্‌পকেটরা বেঁচে গেল। আগে কারো পকেটে কিছু আছে কিনা চেষ্টা ক'রে জানতে হোতো—এখন তো হৃষীকেশ তাদের সবাইকে ব্যাজ্ লাগিয়ে মার্কামারা করে' ছেড়ে দিয়েছে। এখন আর চেষ্টা করতে হয় না, কারা পকেট বাঁচাবার জন্যে তৎপর, চেষ্টা না করতেই জানা যায়। তারপর যতই সাবধানে থাকো না কেন—এক জনের পকেট আরেকজনের পকেটস্থ হতে আর কতক্ষণ ?

দল তো ভেঙে গেলই, হৃষীকেশও সেই থেকে ভগ্নমনোরথ। তবে হৃষীকেশ চিরদিনই ভাগ্যবান, ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ, কন্‌সোলেসন্ প্রাইজ্ হিসেবে, একটা ভিক্টোরিয়া ক্রস সে পেয়ে গেল—সেই সদলবলে ঠ্যাঙান্ খাওয়ার পর দিবসেই। কোনো এক অজ্ঞাত বন্ধুর উপহার নিশ্চয়ই,—অবজ্ঞাত কোন বন্ধুরই, হয়ত বা। অবিশ্বস্তসূত্রে পাওয়া বলে হৃষীকেশ কোনোদিন সেটা পরেনি—

পরতে সাহস করেনি, দরজা জানলা ভালো করে এঁটে একদিন কেবল লুকিয়ে আমাকে দেখিয়েছিল। আর চুপি চুপি বলেছিল আমায়ঃ "জেনারেলের বুক থেকে যারা এরকম একখানা হাতাতে পেরেছে তাদের সঙ্গে চালাকি করতে যাওয়া ইয়ার্কি নাকি ?"

হৃষীকেশ আমার সামনে বসে আবার নতুন দলে দলীয়ান্ হয়ে নব বলে বলীয়ান হবার স্বপ্ন ছাখে, আর আমি? আমি ওকে দেখি। এই হৃষীকেশ! বয়সে আমার দ্বিগুণ হলেও উৎসাহে আমার চতুর্গুণ। আমি সামান্য একটা কাট্‌লেট্‌কেই দলা পাকিয়ে মুখে তুল্‌তে কাহিল হচ্ছি—ছুরি দিয়ে কাট্‌তে হিম্‌সিম্ খাচ্ছি, আর ও কিনা, অম্লানবদনে, এতগুলো দুর্ঘটনার পরেও, আবার নতুন করে' দলাদলি পাকাবার মৎলব ভাঁজ্‌ছে।

হৃষীকেশ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লঃ "নাঃ, এবার নামটা বেশ যুৎসই রাখ্‌তে হবে। অল্পের মধ্যে, অথচ নিঁখুৎ! আমার সর্ব্বদা-রাস্তার-বাঁদিক-দিয়ে-হন্টনকারী-সঙ্ঘ কেবল লম্বাচৌড়া নামের জন্যেই উঠে গেল। একদল বল্ল, উচ্চারণ করতে পারা যাচ্চে না, আরেকদল বল্ল, মনে রাখা ভারী শক্ত—আরেক দল বল্ল—আরেক দল কী বল্ল—?" হৃষীকেশ আমাকেই জিজ্ঞেস্ করল।

"বল্ল বোধ হয় যে এদলে নাম লেখালে তাদের বদ্‌নাম হবে ?" আমি আন্দাজ করে' বলি।

"ঠিক তাই। তারা বল্ল যে হন্টনকারী সঙ্ঘের সভ্য বলে'

জাহির হলে সবাই টের পেয়ে যাবে যে তাদের একদম্ মোটর নেই। আর কোনো কালে ছিলও না কখনো। সেটা ভয়ঙ্কর অপবাদ। আর এখন পেট্রোল কড়াকড়ির দিনে মোটর আছে কিন্তু চড়তে পারছিনে বলে বেমালুম্ যখন নিজেকে চালানো যায়, তখন সে-সুযোগের অপব্যবহার করাটা নেহাৎ বোকামি। এই বলে' সভ্যরা সব, বাকী চাঁদাটা না দিয়েই, ব্যাঙাচির ল্যাজের মত একে একে খসে গেল।"

"তাহলে উপায় ?"

"তার আবার উপায় কি ? সে দল তো মাঠে মারা গেছে, এখন এদিকের কথা ভাবো ? কী নাম দেয়া যায় ভাবো দিকি ? যাদবপুর রক্ষণাবেক্ষণ সমিতি—এই নামটা কি খুব সুবিধের হবে ? আচ্ছা, যাদবপুর রক্ষোবৃন্দ—এটা কেমন ? একটু রাক্ষস-রাক্ষস গন্ধ, তাই না ? আচ্ছা, তাহলে একটু কাব্যি-কাব্যি নাম রাখা যাক্! যাদবপুর আর যদুপুর তো একই মানে, এক জিনিস তো, যদুপুরমধুমাছি—করলে খুব খারাপ হবে কি ? অথবা, ধরো—"

অনেক ধরাধরির পর অবশেষে যদুবংশধব সমিতি এই নামই সাব্যস্ত হোলো। নিজেই ও সাব্যস্ত করল। যাদবপুর থেকে যদুপুর—এবং যদুপুর আর যদুপুরী যখন অভিন্ন বস্তু—তখন যদুপুরীর বাসিন্দেরা যদুবংশ ছাড়া আর কি ? অতএব, যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্নর ধারায় হৃষীকেশ যাদবপুর থেকে এক

লাফে যদুবংশে এসে পৌঁছল! তাছাড়া—তাছাড়া আসলে কথাটা হচ্ছে এই—হৃষীকেশ নিজেই বেফাঁস করে' ফেল্‌লে—

"আর ভায়া! কামান বন্দুক তো দেবে না আমাদের দেশরক্ষা করতে। বাঁশের লাঠিতেই কাজ সারতে হবে। কাজেই বংশধর বলা কি 'বে-অন্যায়' কিছু হয়েছে?"

"সে কথা ঠিক। কামান দূরে থাক্, তুমি একটা ভিক্টোরিয়া ক্রশ্ পেয়েছ—তা যে করেই পাও—কিন্তু তাই তোমায় ধারণ করতে দিচ্ছে কি? পরাধীন দেশের কত অসুবিধে! পরতে গেলেই পুলিসে ধরবে। ধারণ করা দূরে থাক্, ধারণা করতেই আমার বুক কাঁপচে।"

হৃষীকেশ আমাকে পরিত্যাগ করে' যাবার পর আমার মন খারাপ হয়ে গেল! যাদদপুরে আমার মামারা থাকে, মামার জন্যে যতটা না হোক্, যমুনার জন্যই আরো। যমুনা আমার মামাত বোন—তার জন্য ভারী মন কেমন করতে লাগল! বাল্যকালে কতবার যে আমাকে মৃত্যুমুখ থেকে সে বাঁচিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। মামার প্রচণ্ড তাড়নায়, ছাদের পাঁচিল টপ্‌কে সরু কার্নিসের সংক্ষিপ্ত পরিসরে দাঁড়িয়ে সভয়ে যে সময়ে আমি কাঁপতাম সেই সময়ের কথাই বল্‌ছি। সেই সময়েই সে বারম্বার আমাকে মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষা করেছিল। হাতের নাগালে পেয়েও ঠেলে ফেলে দ্যায়নি সে কথা বল্‌ছিনে—নীচে তখন একবার পড়তে পারলে আর রক্ষা ছিল না, একদম্ ছত্রাকার!—সেই সময়ে ঘন্টার পর ঘণ্টা চকোলেট্ সাপ্লাই

করে' আমার জীবন ধারণে ও সহায়তা করত। তারি আমি তারিফ করছি। আছা! যমুনার কথা ভাবলে এখনো আমার জিভে জল আসে—মামাত বোনের এমন নিস্বার্থপর নমুনা খুব কমই দেখা যায়।

সেই যমুনালয় এখন যমালয় হয়ে উঠেচে মনে করতেই মন দমে গেল। সেখানে এখন চারধারে পঞ্চম বাহিনীরা নেচে বেড়াচ্চে—ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। সেই যমুনাকে এই সুযোগে তার মৃত্যুমুখ থেকে বাঁচানো আমার শুধু কর্ত্তব্য নয়, দায়িত্বও বইকি। নিতান্ত মৃত্যুমুখ থেকে না পারি—অদ্দূর ওর সঙ্গে এগুবার আমার সাহস হবে কি না সন্দেহ, তবু পঞ্চম-বাহিনীর সম্মুখ থেকে তো বাঁচাতে পারব ?

বেশীক্ষণ স্থির থাকতে পারলুম না। তক্ষুণি একখানা তিন নম্বর বাসে চেপে শেয়ালদা পৌঁছে লোক্যাল্ ট্রেণের টিকিট কেটে বস্‌লুম।

কলকাতা থেকে এক পা বাড়ালেই যাদবপুর। আর ইষ্টিশনে পা নামাতেই জনার্দ্দন !—

দেখবামাত্রই জনার্দ্দন সটান্ কানের গোড়ায় এসে হাজির ঃ "এধারে ভারী গোলমাল হে—ভয়ানক—একটু আগেই হৃষীকেশের সঙ্গে আমার দেখা—"

"পঞ্চমবাহিনীর সৈন্যসামন্তরা টর্চ্চ হাতে করে চারধারে ওৎ পেতে বসে আছে—এই ত ? আমাকেও বলছিল হৃষীকেশ।"

"তুমিও শুনেচ তাহলে? ওর যদুবংশধরদলে যোগ দিচ্ছ তো?"

"দেখি। বংশ ধারণ করতে পারব কিনা, দেখি আগে।"

সবার আগে আমার যমুনাকে দেখা দরকার—তারপরে অন্য কথা। গিয়ে দেখলাম, যমুনাও যদুবংশে যোগদান করে' বসে আছে। বেথুন কলেজ থেকে ফেরার পথে এক ট্রেণেই ফিরছিল ও আর হৃষীকেশ। সুতরাং, আর বলবার কিছু ছিল না, সে-ই আরো আমায় শুনিয়ে দিল।—"কেন, মেয়েরা কি দেশের জন্যে প্রাণ দিতে পারে না?"

"মামা? মামাও কি যদুবংশে—?" আমি ভয়ে ভয়ে জান্‌তে চাই!

"বাবার কাছ পর্য্যন্ত এগুনো যায় নি এখনো। তুমি বলো না বাবাকে?"

"আমি! বাবারে! এত বড় হয়ে ভারী হয়ে আর পারব না।"

"বড় হয়েও এত ভীতু কেন তুমি বলতো?" যমুনা আমার প্রতি অবজ্ঞাভরে তাকায়ঃ "বাবার কাছে এগিয়ে যাবে, গিয়ে বল্‌বে, এতে পারা না পারার কী আছে?"

"খুব ভারী হয়ে গিয়েছি কি না। ওজন বেড়ে গেছে এখন।" আম্‌তা আম্‌তা করে আমি সাফাই গাইঃ "এখন তো আর সেই চব্বিশ সেরটি নেই—একমণ চব্বিশ সের হয়েছি। কতো ভারিক্কী একটা মানুষ আমি ভেবে ছাখ্‌!"

"ভারী হয়ে তো হাতী হয়েছেন। মামার কাছে এগুতে পারেন না। ভারিক্কী না কচু!"

"এগুতে পারব না কেন, এক্ষুণি এগুতে পারি—কিন্তু পেছুতে হলেই তো হয়েছে। সেই ছোট্ট কার্নিসে আর আমার স্থান নেই। সে বোধ হয় আমাকে আর দাঁড়াতেই দেবে না। এই দেহ নিয়ে সেখানে দাঁড়াতে গেলে সবশুদ্ধ হুড়মুড় করে' নীচেই নামিয়ে দেয় কিনা কে জানে!"

"য়্যাতো তোমার প্রাণের ভয়? তবেই তোমার দ্বারা দেশোদ্ধার হবে।" যমুনা আমার দিকে তাচ্ছিল্যসূচক দৃক্‌পাত করে।

"হৃষীকেশের যতো বাড়াবাড়ি! কোথায় কি তার ঠিক নেই—একেবারে যদুবংশ ধরে টানাটানি।" আমি বলি। বিরক্ত হয়েই বলি। যমুনার এই ভাবান্তরের জন্যে আমার ভীরুতার চেয়ে—ভীতু তো আমি চিরকাল!—তার বীরত্বই বেশী দায়ী বলে' আমার মনে হয়। মনের ভেতরটা খচ্‌ খচ্‌ করতে থাকে।

"পঞ্চমবাহিনী না ছাই! একটাও যদি পঞ্চম ফঞ্চমের টিকি দেখ্‌তে পাওয়া যায় কোথাও, তুই দেখে নিস্‌!" কিন্তু ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আমাকে মত পাল্‌টাতে হোলো। আমাদের সুনীলচন্দ্র—সুনীল আমার মামাত ভাই—হন্তদন্ত হয়ে এসে বল্ল:—"শোনো শোনো!—ঐ মোড়ে···ঐখেনে··· তারিণীবাবুর বাড়ীর পাশে···" থেমে থেমে সে বলে যায়:

"...সেই মাঠটায়...ছেলেরা যেখানে ফুটবল পেটে...আশ্চর্য্য এক কাণ্ড হচ্চে...আমি শঙ্করের কাছ থেকে কাল্‌কের হোম্‌-টাস্‌ক্ জেনে ফিরছি...দেখতে পেলাম।"

"কী—কী—কী—?" যমুনা আর আমি সমস্বরে বলে' উঠি।

"একটা টর্চ্চ্। কে একজন টর্চ্চের আলো ফেলে সারা মাঠখানা চষছে। ভূত মনে করে আমি পালিয়ে আল্‌ছিলুম, তারপর আমার মনে হোলো পঞ্চমবাহিনীও তো হতে পারে। তারপর আমি আজকেই—আজ বিকেলেই হৃষীকেশবাবুর যত্নবংশে ভর্ত্তি হয়েছি যে, কি করে' পালাই ? কাজেই লোকটাকে দেখবার জন্যে আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম।—"

"বাঃ বাঃ। এই তো আমার ভাই। আমার ভাইয়ের মতই কাজ তো !...তুমি একটা কিস্‌সু না !" যমুনা একবাক্যে আমাদের সাধুবাদ আর নিন্দাবাদ ঘোষণা করে।

"তারপর কী হোলো ? কী দেখলি কাছে গিয়ে ? পঞ্চম-বাহিনী না ভূত ?" আমি সুনীলকে সত্রাসে প্রশ্ন করি। ভূতদের আমার একদম্ পছন্দ নয়। পঞ্চমবাহিনীর চেয়েও পঞ্চাননের এই বাহিনী খারাপ। এবং যদি তারা দৈবাৎ অদৃশ্যতা থেকে দৃশ্য হয় তাহলে তার চেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারেনা।—"কী তোর মালুম্ হোলো ?"

"দেখ্‌লাম একটা মানুষ। এ পাড়ার নয়—এ মুলুকের না—এই দেশেরই নয়। কোনো বার্ম্মীজ বা থাইল্যাণ্ডের লোক

হতে পারে। দেখলে মনে হয় ছদ্মবেশে ঘুরচে—অন্ধকারে দেখে যতটা আন্দাজ করা গেল। ভারী সাবধানী কিন্তু লোকটা —কিছুতেই নিজের মুখের ওপর টর্চ্চ ফেল্‌ছিল না। আর ব্যাড় ব্যাড় ব্যাড়র ব্যাড়র করে' বিদেশী ভাষায় কী যে বল্ল তার কিচ্ছু আমি বুঝতে পারলাম না।"

"জাপানী বোমারুদের ডাকবার অপেক্ষায় আছে।" যমুনা বল্ল: "হুম্। এক্ষুনি গিয়ে পাক্‌ড়ে ফেলা দরকার।"

"পুলিসে খবর দিয়ে দাও। আমাদের গিয়ে কাজ কি ?" আমি বলি।

"আগে তো পাক্‌ড়াই আমরা। তারপর পুলিস! মারা যাক্ চাঁদা করে তো! একটু হাতের সুখ করব না ?" সুনীল সুখের সন্ধানী—কিম্বা—কিম্বা হয়ত বা ইস্কুল-লব্ধ নিজের জীবনের দুঃখবেদনা তুল্‌তে চায়।

"যদুবংশের আর কে কে আছে আশে পাশে ? তাদের খবর দিতে হয়।" যমুনা বলে।

"দুনম্বর সদস্য তুমি আছো ছোড়্‌দি আর চার নম্বরে আমি। তিন নম্বর জনার্দ্দন বাবুকে ডেকে আন্‌ব ?"

"এক্ষুনি নিয়ে আয়। কিন্তু এক নম্বর গেলেন কোথায় ?"

"এক নম্বর—হৃষীকেশবাবু—অন্যান্য নম্বরদের সৃষ্টি করে বেড়াচ্ছেন। তাঁকে কোথায় পাব ?"

বল্‌তে বল্‌তে সুনীল চলে যায় এবং দেখতে দেখতে জনার্দ্দনকে নিয়ে ফিরে আসে।

সঙ্গে সঙ্গে এধারের প্ল্যান্ আঁটা হয়ে গেল। সুনীল তারিণী-বাবুর বাড়ীর দিক থেকে এগুবে আর জনার্দ্দন পূর্ব্বধার থেকে চড়াও হবে। যমুনার হোলো গিয়ে উত্তরায়ণ—আর আমি? আমি দক্ষিণ তরফ থেকে—(এদিকটা বেশ চওড়া আর চূড়ান্ত ফাঁকা)—আস্তে আস্তে ঘেরাও করে' আস্‌ব—অবশ্যি এক জনের পক্ষে গোটা একটা দিক যদ্দূর বেশী ঘেরাও করে আসা সম্ভব।

এই বিজাতীয় অভিযানে যোগ দেবার আমার একটুও উৎসাহ ছিল না। একেই আমার অ্যাড্‌ভেঞ্চারের স্পৃহা নেই, আদপেই নেই, তার ওপরে এই সব পঞ্চমবাহিনীরা—শোনা গেছে—ভারী বিশ্রি জিনিস! আমার বদলে, একটিনি হিসেবে, আমি সুনীলের টম্‌কে পাঁচ নম্বরের সদস্য করে' দিতে প্রস্তুত ছিলাম—এবং সেও আমার বলবার আগেই লেজ তুলে তৈরী হয়েছিল, অনুরোধের অপেক্ষা রাখেনি। তখন থেকেই সুনীলের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নিজের পতাকা ওড়াচ্ছিল!

কিন্তু টম্ গেলেও, আমার বকলমে যাবে কিনা, যেতে রাজি হবে কি না—সেই এক সমস্যা। যতটা বোঝা গেল, সুনীলের ধার ঘেঁষে আগুয়ান হবার তার বাঞ্ছা, মাঠের দক্ষিণ দিক থেকে একাকী বীরের মত—যদ্দর সম্ভব ঘেরাও হয়ে—গোটা

একটা দিক ঘোরতর ভাবে রক্ষা করে যদুবংশের মুখরক্ষা করার মতলব তার নেই।

অগত্যা আমাকেও এগুতে হোলো। বীরদর্পেই এগুলাম, পা টিপে টিপে। সুনীল মিথ্যে বলেনি। মাঠের মাঝখানটায় আলেয়ার মতো টর্চ্চের আলো জ্বল্‌ছে আর নিভছে—এখনও—আমি যেধার দিয়ে মেদিনী কাঁপিয়ে এগুচ্ছিলাম—কিন্তু এগুবো যে তার যো কি !—সেধারটায় যেধারেই পা বাড়াই কেবল গর্ত্ত। এদিকটা স্লিট্ ট্রেঞ্চে বোঝাই, বোঝা গেল। কোনো-দিকে পা ফেলবার উপায় নেই—উল্‌টে পা ভাঙবার অব্যর্থ সুযোগ !

যাই হোক, উঠিপড়ি করে তো টর্চ্চারের কাছ পর্য্যন্ত পৌঁছলাম। এধার-ওধার থেকে সুনীল আর টম্—জনার্দ্দন আর যমুনা—এরাও সব ঘেরাও হয়ে এসেছিল। তারপর হাতের সুখ যা একখানা হোলো তা কহতব্য নয়। জনার্দ্দন আর সুনীলের এলো-পাথাড়ির মাঝখানে আমিও কসে একটা চড় বসিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু তার পরমুহূর্ত্তে নিজের গাল জ্বালা করতে লাগল দেখে নিরস্ত হয়ে গেলাম। গোলমালের মধ্যে মারামারি করতে যাওয়া ঠিক না, ওতে মারধোরের গোলমাল হয়ে যেতে পারে।

যমুনারও হাতের সুখের ব্যত্যয় হয়নি। সেও ফাঁক্‌তালে বেশ কয়েকটা চিম্‌টি কেটে নিতে পেরেচে। সংবাদটা সত্যি হওয়াই সম্ভব। কেননা সুনীল বল্‌তে লাগল, তার পিঠ কেন

যে দপ্ দপ্ করছে, বলা যায় না। হঠাৎ সাপে কাম্ড়ালো কিনা কে জানে! (তবে পঞ্চমবাহিনীটাও কামড়ে দিতে পারে, আশ্চর্য্য নয়!)

ইতিমধ্যে পড়ে-যাওয়া টর্চ্চটা কুড়িয়ে নিয়ে সমগ্র কুরুক্ষেত্রের ওপরে আমি আলোক বিকিরণ করি। ওমা! এ কে? এ যে আমাদের—

"আরে, হৃষীকেশ যে! তুমি আবার এখানে কোথ্-থেকে?"

হৃষীকেশ ব্যাড় ব্যাড় করে যা বল্ল তার মর্ম্ম, অন্ধকারে মাঠ পেরিয়ে তারিণীবাবুর বাড়ীতে সে যাচ্ছিল—তাঁকে সদস্য বানানোর জন্য। হঠাৎ একটা সিট্ ট্রেঞ্চে হুম্ড়ি খেয়ে পড়ে তার বাঁধানো দাঁতের ওপরতলা খসে পড়ে গেছে। অন্ধকারে হাতড়ে না পেয়ে, বাড়ী থেকে টর্চ্চ নিয়ে ফিরে এসে তখন থেকে অনেক খোঁজাখুঁজি করছে—কিন্তু এখনও সেই উপর-ওয়ালা দাঁতের পাত্তা পায়নি। তার মাঝখানে—

তার মাঝখানে তার অধস্তন দাঁতগুলোর অবধি কি দুর্দ্দশা হয়েচে, টর্চ্চের আলোতেই আমরা চাক্ষুস করলাম। একটিও আর আস্ত নেই!

এর মধ্যে এক ফাঁকে আমাদের বাহিনীর পাঁচনম্বরী—পঞ্চম সদস্য শ্রীমান্ টম্ এক চক্কর ঘুরে এসেচে। তার মুখে কোনো সাড়া শব্দ নেই! তার এহেন স্বভাব-দুর্ল্লভ মৌনতা

দেখে তার দিকে টর্চ্চের আলো ফেলে দেখি অঘটনের পরে আরো অঘটন !—

তার মুখে বাড়তি আরেক দন্তপংক্তি !

তার নিজের নয়। স্বয়ং আমাদের যদুপতির।